পঞ্চম অধ্যায় ঃ চতুরঙ্গ

৫.১. চতুরঙ্গ ঃ পালাবদলের পালা -

চোখের বালি যদি হয় উনিশ শতকের উপন্যাস শিল্পের প্রচলিত ছক ভেঙে বেরিয়ে আসার রাবীন্দ্রিক প্রয়াস, তবে *চতুরঙ্গ* যেন নিজেকেই অতিক্রম করার দুঃসাহসিকতায় দীপ্যমান। যা প্রথানুগত পূর্বাপর সমস্ত ধারণাকে চুরমার করে উপন্যাস শিল্পরূপের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে। মগ্নচৈতন্য মন্থনজাত অভিজ্ঞতা অনুষঙ্গকে বাণীময় করার তাগিদে যে অনবদ্য ভাষারীতি ব্যবহৃত হয়েছে, তা এযাবৎকাল সযত্নলালিত ভাষা প্রকরণকে অতিক্রম করে ভাষার সম্ভাবনাকে প্রসারিত করেছে আরও। *চোখের বালি* থেকে প্লটের আধিপত্য খর্ব করার যে প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, চতুরঙ্গে এসে যেন সেই পরিক্রমা চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে। চরিত্রের 'আঁতের কথা'র প্রতি মনোনিবেশ করে *চোখের বালি* রচনার মধ্যদিয়ে ঘটনামোহ থেকে বাংলা 'উপন্যাসকে মুক্ত করলেও গোরা পর্যন্ত কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনা পরিহার করেন নি'। *চতুরঙ্গতে* রবীন্দ্রনাথ বৃত্তাকার কাহিনীবিন্যাসের প্রকরণটিকেও ভেঙে দিয়েছেন। "চতুরঙ্গ এবং ঘরে-বাইরে-তে রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে বাংলা উপন্যাসের পরম্পরা ভেঙে বেরিয়ে এলেন। উপন্যাসে প্লটের দাপট দমন করেছিলেন আগেই - চতুরঙ্গতে এবার তাকে বর্জন করে চরিত্রের, শুধু চরিত্রের আঁতের কথায় মনস্ক্রিয়ার বর্ণনায়, জমিয়ে তুললেন উপন্যাস। ফলে উপন্যাস একান্তভাবে হয়ে উঠল অন্তর্মুখীন।"[১] আর ঠিক এ কারণেই প্রচলিত পাঠাভ্যাসে অভ্যস্ত মন চতুরঙ্গে উপন্যাসত্ব অন্বেষণে ব্যর্থ হয়, মনে হয় 'বড়ো বেশি পাতলা হাওয়ার বই'। যে গতিচেতনা 'বলাকা'র কেন্দ্রীয় ভাবসত্য, চতুরঙ্গে সেই গতিবাদের আর এক রূপ দুর্লক্ষ্য নয়। শচীশ দামিনী, শ্রীবিলাস সকলেই জীবনার্থ অন্বেষণের লক্ষ্যে চলিষ্ণু। আপাত দৃষ্টিতে শ্রীবিলাসের জবানিতে শচীশের আত্মানুসন্ধান চতুরঙ্গের একমাত্র বিষয় বলে মনে হলেও নিবিষ্ট পাঠে অনুভব করি শুধু শচীশ নয়, দামিনী শ্রীবিলাস সকলেই যেন 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে'র লক্ষ্যে ছুটে চলেছে, এরই সাথে নেপথ্যে জগমোহন মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে চলেছে। এই হয়ে

চলা সত্তার ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে ঘটে চলে, তাই তা দৃশ্যগ্রাহ্য নয় ততটা, যতটা অনুভববেদ্য। মগ্নচৈতন্যের অনুভূতিকে বাণীময় করার লক্ষ্যে বাচনও যেন ভাষার প্রান্তসীমা ছুঁয়ে পরাবাচন সংলগ্ন হয়েছে। ভাষা তাই এক্ষেত্রে তার নির্দিষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নি, হয়েছে অনেকার্থদ্যোতক। *চতুরঙ্গ* তাই নিজেকে বিনির্মিত করার সমস্ত সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রেখেছে নিজের মধ্যে। আজও তাই চতুরঙ্গ মঞ্চায়িত হয়, চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে ওঠে, 'অন্য কোথাও অন্য কোনো' তাৎপর্যের উপকূলে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতিতে।

- ১ -

৫.১.১. প্রেক্ষাপট যখন পথ সন্ধানের শতক -

গোরার পর *চতুরঙ্গ* রচনাকালের ব্যবধান প্রায় পাঁচ বছর। প্রবাসীতে *গোরার* প্রকাশ শেষ হয় ১৩১৬ সনের ফাল্গুন মাসে, সবুজ পত্রে চতুরঙ্গের প্রকাশ ১৩২১ এর অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত। *গোরার* ঘটনাকাল ছিল উনিশ শতকের আটের দশকের প্রথম দিক (পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য), চতুরঙ্গের ঘটনাকাল উনিশ শতক ছাপিয়ে প্রবেশ করেছে বিশ শতকে। চতুরঙ্গে ঘটনাকাল-জ্ঞাপক কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকলেও 'যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল' (শচীশ - ১) সেই বছর জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ঘটনাকাল ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আশে পাশের সময়। গবেষক তপোব্রত ঘোষ উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন "উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শ্রীবিলাসের ডায়ারি শুরু হয়ে শেষ হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দর গোড়ায়।"[২] অর্থাৎ দেখাযাচ্ছে রচনাকালগত দিক দিয়ে *চতুরঙ্গ* যেমন *গোরা* পরবর্তী রচনা, তেমনি ঘটনাকালগত দিক দিয়েও চতুরঙ্গে *গোরা* পরবর্তী ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। বাঙালীর বিবর্তিত ইতিহাসের একটা গতি-প্রকৃতি যেন উপন্যাসটিতে বিধৃত।

সমগ্র উনিশ শতকটাই ছিল মূলতঃ পথ সন্ধানের শতক। একই মানুষের জীবনে কখনও একই সময়ে দুটি ভিন্ন বিশ্ববীক্ষার মিশ্রিত রূপ যেমন প্রত্যক্ষ করা গেছে যার মূর্ত প্রতীক

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আবার একই মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা মূর্ত হতে দেখা গেছে। যেমন জীবনের প্রথম পর্যায়ে র‍্যাডিক্যালপন্থী কেশবচন্দ্র সেন পরবর্তী জীবনে অতীন্দ্রিয়বাদী রক্ষণশীলে পরিণত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে *গোরা* উপন্যাসের আলোচনাকালে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অধিকাংশের শোচনীয় পরিণতির ইতিহাস আমরা লক্ষ্য করেছি। শচীশের মধ্যদিয়ে এই পথ সন্ধানের আর্তিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার এই শতকের এই দোদুল্যমানতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন- "উদ্ভুত কোনও একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এর যে কোনো একটি ধারণায় বিশ্বাসী মানুষরা প্রায়শই দোদুল্যমানতার শিকার হয়ে আঁকড়ে ধরত অন্য বিশ্বাসটিকে।"[৩] শচীশের জীবনও এই পথ সন্ধানেরই ইতিকথা।

৫.১.২. রবীন্দ্রসাহিত্য ও চতুরঙ্গ -

বস্তুতঃ স্বধর্ম অন্বেষণে শচীশের যে সাধনা, উপলব্ধির যে স্তরে শচীশ উন্নীত হতে চেয়েছে, চতুরঙ্গের এই কেন্দ্রীয় ভাবসত্যের প্রতিফলন রবীন্দ্র সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

ক ঃ- *চতুরঙ্গ* প্রকাশের দুই বছর পূর্বে প্রকাশিত ছিন্নপত্রের (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)[৪] ১৫০ সংখ্যক পত্রে (পত্রের তারিখ- অক্টোবর, ১৮৯৫) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠেনা। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভুত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে জ্ঞানদান করতে হয়, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই - আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। ... এই আমার অন্তর বাহিরের মিলনে যা নিরন্তর ঘঠে উঠছে, আমার ক্ষুদ্রতা তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার করে তাকে যেন আচ্ছন্ন না করে, আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অনুকূল হয় - নিখিলকে আমার মধ্যে যেন আমি বাধা না দিই। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত

ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্তস্কার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি আমি ধন্য।"[৫] স্বধর্ম অর্জনের জন্য শচীশের ব্যকুলতার সাথে উদ্ধৃত অংশের সাদৃশ্য অলক্ষিত থাকে না।

খ ঃ- মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "উপনিষদ বলেছেন ... তং বেদ্যং পুরুষং বেদ। যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।"[৬]

গ ঃ- বহু সাধনার পর রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের গভীর তত্ত্ব সম্পর্কে শচীশ উপলব্ধি করেছে - "তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আরমা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।" (শ্রীবিলাস-৩) উৎসর্গের ১৭ সংখ্যক কবিতাটি যেন শচীশের এই উপলব্ধিরই কাব্যরূপ-

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা॥"[৭]

ঘ ঃ- শচীশের অরূপের সাধনা, রূপের প্রতিনিধি দামিনী স্বাভাবিক ভাবেই তাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে *রূপ ও অরূপ* প্রবন্ধে "আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের

সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুবসত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে।"[৮]

এ ধরণের উদ্ধৃতি রবীন্দ্র সাহিত্যে দুর্লভ নয়। এরই পাশাপাশি 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে' মুক্তির স্বাদ লাভ করার অভীপ্সাও বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যে নানা ভাবে উচ্চারিত হয়েছে, শ্রীবিলাসের মধ্যদিয়ে যার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অরূপ সাধনার রবীন্দ্র দর্শন যা শচীশের আধ্যাত্মসাধনার মধ্যদিয়ে ব্যক্ত, তা রবীন্দ্র জীবনে আকস্মিক কোনো বিষয় নয়। আর এখানেই প্রশ্ন জাগে, তবে কোন নিগূঢ় কারণে এই বিশেষ সময়ে লেখা হল *চতুরঙ্গ*, কেনই বা উপন্যাস শিল্পের প্রচলিত ছকের বাইরে গিয়ে এর শিল্পরূপ হয়ে উঠল এতটা অভাবিত। এক্ষেত্রে 'যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সঙ্গত'[৯] বলে যেহেতু আমাদের বিশ্বাস, তাই রবীন্দ্র প্রতিভার এই পর্বান্তরটিকেও আমরা বুঝে নিতে চাই রচনাকালীন সময়ের অভিঘাতের নিরিখে। এই পর্যায়ে শুধুমাত্র *চতুরঙ্গ* বা *ঘরে-বাইরেই* নয় বরং কাব্য নাটকের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র সাহিত্যে একটা পালাবদল লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকের ভাষায় "রবীন্দ্র সাহিত্যের এই পর্বটিকে পট পরিবর্তনের পর্ব বলা যায়। কাব্যের ক্ষেত্রে বলাকা ও পলাতকা, নাটকের ক্ষেত্রে ফাল্গুনী এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে চতুরঙ্গ ও ঘরে-বাইরে এই পট পরিবর্তনের গূঢ় লীলাকেই প্রকাশ করেছে।"[১০]

৫.১.৩. ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও নতুন আঙ্গিকের অনিবার্যতা -

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে *গোরা* আলোচনাসূত্রে আমরা দেখেছি স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বেচ্ছা বিবিক্ততার কালে তাঁর নবলব্ধ ভারতবোধ তাঁকে কিভাবে *গোরা* রচনায় প্রাণিত করেছিল। *গোরা* থেকে *চতুরঙ্গ*, সময়ের ব্যবধান পাঁচ বছরেরও কিছু বেশি। এই অন্তর্বর্তী সময়পর্বে অন্ততঃ চারটি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল -

এক ঃ- ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে সরকারী ঘোষণা।

দুই ঃ- রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্যভ্রমণ (২৪ মে ১৯১২ থেকে ৬ অক্টোবর ১৯১৩)

তিন ঃ- নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (নভেম্বর ১৯১৩)

চার ঃ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (আগষ্ট ১৯১৪ থেকে নভেম্বর ১৯১৮)

৫.১.৩.১. স্বদেশী-উত্তর প্রভাব -

এক ঃ- "অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ামের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্ব স্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।"[১১] *জীবনস্মৃতি*দ্ধৃত এই অংশটিতে কৌতূকের আপাত আবরণ সরিয়ে যা বড় হয়ে ওঠে তা হল, একটি আন্দোলনের করুণ পরিণতি। যার সাথে জড়িত ছিল একটি জাতির সামাজিক উদ্ভাসের সম্ভাবনা। এই গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিভাবে রবীন্দ্র উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল একটি চলিষ্ণু সত্তা, অন্ততঃ তাঁর উপন্যাসের নিবিড় পাঠে এই প্রতীতিই জন্মায়। ঔপনিবেশিক আমলে উপনিবেশের প্রয়োজনে সৃষ্ট এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঔজস্কল্য, সীমাবদ্ধতা, স্বপ্নভঙ্গ, আত্মপ্রতারণা প্রভৃতি বিচিত্র প্রবণতা রবীন্দ্র উপন্যাসে বিভিন্ন ভাবে মূর্ত হয়েছে। আধুনিকতার অসম্পূর্ণতাকে জন্মসূত্রে লালন করে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজের দুর্বলতা ও ঔজস্কল্য দুটি দিক সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ সজাগ ছিলেন। বৃহত্তর জীবনপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংকীর্ণতা স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেদিন পরিশোধিত হবার একটা সুযোগ পেয়েছিল। স্বদেশীর নামে শহর সেদিন গ্রামমুখী হয়েছিল। উল্লসিত রবীন্দ্রনাথ নিজেও মহামিলনের সেই লগ্নে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেন নি, চলে এসেছিলেন সামনের সারিতে। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁ তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি সেদিন স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে খুঁজেছিল।

> "স্বদেশী ভাব উনিশ শতকের শেষ থেকেই দেখা দিয়েছিল - স্বদেশী আন্দোলন সেই ভাবেরই ঘনীভূত প্রকাশ। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয় কলকাতায়, অল্পদিনের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মফসসল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে। যা ছিল শহরবাসী ইংরাজিশিক্ষিত ভদ্রলোকদের সীমিত প্রতিবাদ অতি দ্রুতবেগে রূপ

নেয় একটি ব্যাপক জনজাগরণের। অন্যদিকে রাষ্ট্রিক আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় স্বদেশী যুগের সংস্কৃতি। সাহিত্যে ও গানে, নাটকে ও যাত্রায়, শিক্ষায় ও শিল্পকলায় স্বদেশী ভাবের অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি হয় এক নতুন উত্তেজনাময় আবহ।"[১২]

দীর্ঘ গণবিচ্ছিন্নতাজনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সার্বিক উদ্ভাসনের একটা সম্ভাবনাময় সোনালি রেখা সেদিন স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেখা গেলেও আন্দোলনের অকস্মাৎ বিপর্যস্ত অবসান সেই ইতিবাচক সম্ভাবনাকে বিপরীত দিক থেকে নেতিবাচক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। স্বদেশী চেতনার বিনষ্টিকাল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয় অবসন্নতার প্রকট প্রকাশকাল হিসেবে ঐতিহাসিক ভাবে চিহ্নিত হয়ে পড়ল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সুমলিন লিগের প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে হিন্দু মুসলমানের অবিভাজ্য বাঙালি সত্তা রাজনৈতিক ভাবে বিভাজ্য হয়ে পড়ল। "বয়কট আন্দোলন কার্যকরীভাবে বিদেশী পণ্য বিক্রি বন্ধ করতে পারে নি। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যে স্তিমিত হয়ে আসে। গঠনমূলক কাজ ক্রমশ জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বহুক্ষেত্রে জমিদারের সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবকরা সাধারণ মানুষকে উৎপীড়ন করতে ছাড়ে নি ... সরকারী তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আন্দোলনের প্রধান নেতাদের গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই স্বদেশী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পুলিশের অত্যাচার এর প্রধান কারণ নয়। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য এই আন্দোলন পরিশেষে ব্যর্থ হয়। বাঙালী ভদ্রলোকেরা কৃষকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোন বৃহত্তর সংগ্রামের অংশীদার হতে পারেন নি। জমির উপর অংশত নির্ভরশীল মধ্যস্বত্বভোগী ভদ্রলোকদের পক্ষে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব হয় নি। তাই সমাজের elite এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করা গেল না। আন্দোলনের শক্তি ব্যয়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি এবং সমাজ তার চিরাভ্যস্ত পথে ফিরে গেল। একদিকে থাকল আবেদন নিবেদনের ভিক্ষাবৃত্তি অন্যদিকে দুঃসাহসিক গুরুত্বপূর্ণ সন্ত্রাসবাদের অন্ধ গলি।"[১৩] মূলতঃ শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকশ্রেণীর মধ্যেই আন্দোলনের নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই আন্দোলনের সামাজিক সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা। স্বদেশীর উন্মাদনার অবসানে শিক্ষিত যুবমানস যে এক

অনির্দেশ্য শূন্যতার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছিল, শচীশের আত্মানুসন্ধানের শিল্পরূপের ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট হিসেবে তা মূল্যবান। আমাদের ধারণার সমর্থনে দুটি মন্তব্য উদ্ধৃতযোগ্য -

ক ঃ- "হঠাৎ যখন বিনা জিজ্ঞাসা, বিনা বোঝাপড়ায় ১৯১১ তে দিল্লি দরবারের ঘোষণাবলে ভাঙা বাংলা জোড়া লেগে গেল, তখন জীবনপণ জাতীয় উস্কীপনা আর উজ্জীবন মুহূর্তে নিরর্থক হয়ে পড়ল, শাসনযন্ত্রের আনুগত্য ছাড়া এককালের শাসন-বিরোধীদেরও গত্যন্তর রইল অল্পই। পুরোবর্তীরা অনেকেই নিজেদের অস্তিত্বের সংগতি এবং সার্থকতা বজায় রাখতে ব্যস্ত; সহস্র সহস্র তরুণ অনুগামীর দল, স্কুল-কলেজ-বৃত্তি ছেড়ে যারা 'স্বদেশী'র ঝড়ে ঝাঁপিয়েছিল, হঠাৎ নৈষ্কর্মের অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তারা। মধ্যবিত্ত সামাজিক অস্তিত্বের অমন চূড়ান্ত বিড়ম্বনা ছিল কাল্পনাতীত। চারদিক থেকে অস্তিত্ব নিয়ে নিছক বাস্তবিক নয়, একটা নৈতিক সংকট শিক্ষিত তারুণ্যের চেতনাকে বাইরে আড়ষ্ঠ এবং ভেতরে অন্তর্ভেদী করেছিল। সেই মর্মান্তিক অন্তঃসন্ধানের আক্ষেপই দামিনীর চেতনায় ছড়ানো; তারই নিরন্তর তাড়নায় শচীশ শেষ পর্যন্ত দিশেহারা।"[১৪]

খ ঃ- "উনিশশো এগারো থেকে একুশের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক যুবমানসে বেঁচে থাকার প্রকার-প্রকরণ-প্রত্যয় ও পুরষার্থ ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। বলা যেতে পারে উনবিংশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্তের ক্ষণায়ু স্বর্ণযুগের প্রত্যাবর্তন যে আর সম্ভব নয় এ-বোধ দৃঢ় হয়ে ওঠে। ক্ষুদিরামের বিস্ফোরিত বোমাই সমাপ্তি ঘোষণা করল বঙ্গীয় ভিক্টোরিয়ানদের ভ্রান্ত স্টেবিলিটি সাধনার। এই সময়েই বাঙালি যুবক সেই অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চেয়েছে যা তার বর্তমানকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। একই সঙ্গে সে গভীরের দিকে ঝুঁকেছে-নিজের স্বজ্ঞায় মেলাতে চেয়েছে ভাবনা এবং বাস্তবের দুই প্রান্তকে। এই সময়ে চৌস্ক সালে লেখা হল চতুরঙ্গ।"[১৫]

স্বদেশী পরবর্তী যুবসমাজের অবসাদ এভাবেই শচীশের আত্মানুসন্ধানের পরোক্ষ ক্রীড়ণক হয়েছে। আর এভাবেই রবীন্দ্র উপন্যাস হয়ে উঠেছে চলিষ্ণু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন পর্যায়ের

শিল্পরূপ। মহেন্দ্র-বিহারীর অনুৎপাদক জীবনে যেমন 'অকাজের কাজ যত আলস্যের সহস্র সঞ্চয়' এর দুর্বহ ভার রূপ পেয়েছে, গোরার মধ্যে শিক্ষিত সমাজের গণবিচ্ছিন্নতাজনিত যন্ত্রণা মূর্ত হয়েছে, শচীশের মধ্যদিয়ে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই আর এক রূপ প্রতিফলিত। সমালোচকের ভাষায় 'গোরা'তে উত্থান-পতনে বন্ধুর সেই নবজাগরণিক অভ্যুদয়ের তুঙ্গ-বিন্দু; 'চতুরঙ্গ'তে অবক্ষয়ী অবতরণের, আত্মত্রাণ-সন্ধানের মর্মান্তিক উত্তালতা। ... 'গোরা'র শেষে দেখেছি উনিশ শতকীয় প্রত্যয় চেতনার পরমা পরিণতি; 'চতুরঙ্গ'তে বিশ শতকীয় অবক্ষয় ও উৎপাটন - ভারাক্রান্ততার গভীর উদ্ভাস।"[১৬] সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দের জীবনের দুই পর্বে গোরা এবং শচীশের দুই জিজ্ঞাসার সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। "শচীশের যন্ত্রণা নিজেকে মুক্ত করার যন্ত্রণা। গোরার যন্ত্রণা ছিল স্বদেশের ও সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিত হবার প্রয়াসে চঞ্চল। শচীশ নিজেকে অনুভবাতীতলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। গোরা অনুভবগ্রাহ্য মানবিক বাস্তবতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের জীবনের দুই অধ্যায়ের প্রথমটির আবেগের জন্মকালে যে তাড়না সক্রিয় ছিল 'মেঘ ও রৌদ্র'তে এবং 'গোরা'য় তাই প্রতিফলিত ব্যপকতার আকারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আবেগের ছবি যেন শচীশের শেষ উপলব্ধিতে 'যাকে আমি যুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার - আর কিছুতেই আমার দরকার নাই।' ... এমন কথা গোরার কালের কথা কখনো হতে পারত না। শচীশের জীবনের অধ্যায় গুলিকে অনুধাবন করলে শচীশের ভাঙা-গড়ায় বাঙালি মধ্যবিত্তের চলিষ্ণু ইতিহাসের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।"[১৭] অর্থাৎ দেখাযাচ্ছে জন্মসূত্রে যে অসম্পূর্ণতা - পঙ্গুত্ব নিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, তার করুণ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিলই, ইতিহাসের দিক দিয়ে বিশ শতকের প্রথম দশকে যার সূচনা। আধুনিকতার এই অসম্পূর্ণতা-পঙ্গুত্ব নিয়েই বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী আজকের উন্নত ধনতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করে বিশ্বায়নের শরিক হওয়ায় আধুনিকতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অসম্পূর্ণতা-স্ববিরোধ প্রকট হয়েছে আরও। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রে উদ্ভুত শচীশের সেদিনের জীবনজিজ্ঞাসা, আজকের এক শতকের ব্যবধানে উন্নত ধনতন্ত্রে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

৫.১.৩.২. পাশ্চাত্য ভ্রমণজাত প্রভাব -

দুই ঃ- শচীশের আত্মজিজ্ঞাসাকে শিল্পরূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অনিবার্যভাবেই এমন শিল্পরূপের উদ্ভাবন করতে হয়েছে, যা শচীশের জীবন জিজ্ঞাসার উপযুক্ত আধার হতে পারে। এই সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণের অনিবার্য অভিঘাতও চতুরঙ্গে পড়েছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড পৌছান। ইতিপূর্বে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিন মাসের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে ইংলণ্ডকে দেখেছিলেন, এবারের ইংলণ্ড রবীন্দ্রনাথের চোখে অনেকটাই পরিবর্তিত রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল। বাংলায় উনিশ শতকীয় জীবনবোধের যে অবক্ষয় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ইংলণ্ডে এসেও তিনি রেনেসাঁর মানবতাবাদী প্রবর্তনা, ফরাসী বিদ্রোহজাত সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার মহৎ আদর্শের বিপর্যয় লক্ষ্য করেছিলেন। শিল্প বিপ্লবের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ততদিনে মালিক-শ্রমিকশ্রেণীর দুস্তর ব্যবধানের মধ্যদিয়ে ইংলণ্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ফলতে শুরু করেছে। চার্লি চ্যাপলিনের The Modern Time এবং The Lime Light এ যা আজও জীবন্ত। অর্থাৎ বিশ শতকের এই সময়টি শুধুমাত্র বাংলাতেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বেই সংকটের কাল হয়ে উঠেছিল "বিশ শতক হল সংশয়ের হতাশার, এমন কি প্রত্যয়ভঙ্গের যুগ কেবল বাংলাদেশে নয়, বৃহৎ-বিশ্বেও।"[১৮] ইংলণ্ডের সমাজে সার্বিক অবক্ষয়ের চিহ্ন তখন সুস্পষ্ট। "ধনবাদী সভ্যতার পাদপীঠ ইংলণ্ড সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে উদ্ধত; তার সভ্যতা অবক্ষয়িত; দারিদ্র্য অসত্য নীতিহীনতায় সাধারণ জীবন, মধ্যবিত্তসমাজ বিপন্ন। ধনবাদী শ্রেণীর অর্থকরী যন্ত্রবেগের পীড়নে সংবেদনশীল মানুষ হয়ে পড়েছে ছিন্ন, ক্ষুদ্র, একাকী, নিঃসঙ্গ, নৈরাশ্যে মজ্জমান ও অন্তর্মনস্ক। বিশাল ধনবাদী শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্টিশীল ইয়োরোপীয় প্রতিভা ক্রমশ হয়েওঠে চেতনায় বসবাসকারী; তারা আত্মসমর্পণ করে কোনো উচ্চাশার কাছে নয়, আত্মবিবরলালিত ভাবমানসে।"[১৯] পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিকে শিল্প সাহিত্যে রূপ দিতে গিয়ে শিল্প সাহিত্যও অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত রূপ পেয়েছে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) এবং ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের মনোরাজ্যের যে বিচিত্র জগৎ কার্য-কারণ পরম্পরায় সূত্রায়িত করেন, তার প্রভাব শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর ওপর গভীর ভাবে পড়ে। ১৯১০ এর ডিসেম্বরে লন্ডন শহরের

ক্রাফটন আর্ট গ্যালারিতে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী ভ্যানগগ, সেঁজা, মাতিস পাবলো পিকাসো প্রমুখের যে চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল তা শিল্পের এতদিনের পরিচিত জগৎকেই যেন পাল্টে দিয়েছিল। লক্ষণীয়ভাবে সাহিত্যিক ভার্জিনায় উলফ্ ছিলেন এই চিত্রপ্রদর্শনীর অন্যতম একজন ব্যবস্থাপক[২০] মানুষের মগ্নচৈতন্য সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠায় সাহিত্যের বাচন পরাবাচনের সীমায় প্রবেশ করেছে। সাহিত্যের প্রকরণেও ঘটেছে অভূতপূর্ব পর্বান্তর। উপন্যাসে সময় পরিসরের Chronology সম্পর্কিত চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তন ঘটে। ভার্জিনিয়া উলফ্ ঘোষণা করেন on or about December 1910 human nature changed, [২১] এ সময়ের সাহিত্যিকরা অনিবার্যভাবে উপলব্ধি করেন 'Life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelop ...' [২২]

সাহিত্যের এই পর্বান্তরের কালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন এই পরিবর্তনের প্রাণকেন্দ্র ইংলণ্ডে এবং চিত্রশিল্পী ও চিত্রসমালোচক উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের সান্নিধ্যে। যে রোদেনস্টাইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিল্পীর এবং 'অধ্যাপক এডওয়ার্ড টমসন যে রোদেনস্টাইনকে লিখেছিলেন I know that no one did more for Tagore's learning in the west".[২৩] সে সময়ের ইংলণ্ডের অগ্রণী শিল্পী সাহিত্যিকের সাথে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন - "রোদেনস্টাইনের বাড়িতে এক আসরে য়েটস্ তাঁর ভাবগম্ভীর কবিকণ্ঠে গীতাঞ্জলি অনুবাদের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন আর্নেস্ট রীস্, অ্যালিস মেনেল, হেনরি নেভিনসন, এজরা পাউন্ড, মে সিনক্লেয়ার, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, সি. এফ. অ্যানড্রুজ ও আরো অনেকে।... ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল ঃ ইংরেজ পাঠক সাধারণ যেন একদিনেই বাবাকে স্বীকার করে নিল যুগবরেণ্য কবিরূপে।"[২৪] এই সময় যখন 'পরিবর্তমান জীবন প্যাটার্নে চিন্তায় ও চেতনায় ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ যে সময় অস্থির, অত্মদীর্ণ, অন্তর্মনস্ক; প্রতিভাবান ও তরুণসমাজ যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর কার্যকারণতত্ত্বে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদে আস্থা হারিয়ে তীক্ষ্ণ অনুভববেদ্যতা,

সহজাত বৃত্তি ও অন্তর্গত চেতনাপ্রবাহকে, নতুন মূল্যবোধ ও শিল্পাদর্শরূপে অনুধ্যানে অগ্রসর - রবীন্দ্রনাথ তখন ইংল্যান্ডে, তাঁদের মর্মমূলে'।[২৫]

ইংলণ্ডের পরিবর্তিত জীবনধারার পশ্চাৎপট হিসেবে যন্ত্র ও গতি ক্রিয়াশীল ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের নজর এড়ায় নি। *পথের সঞ্চয়* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন -

> "অনেককাল পরে লণ্ডনে আসিলাম। তখনো লণ্ডনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি, কিন্তু এখন মোটর-গাড়ি একটা নতুন উপসর্গ জুটিয়াছে। ... মোটর রথ, ,মোটর-বিশ্বম্বহ, মোটর মালগাড়ি লণ্ডনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারায় ছুটিয়া চলিতেছে। আমি ভাবি, লণ্ডনের সমস্ত রাস্তার ভিতরদিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাণ্ড। যে-মনের বেগের ইহা ব্যহ্যমূর্তী তাহাই বা কী ভীষণ! দেশ-কালকে লইয়া কী প্রচন্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে।"[২৬] এবং
>
> "জানালা খুলিয়া দেখি, জনস্রোত নানাদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মনে মনে ভাবি, ইহারা যেন কোন এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। ... লক্ষ লক্ষ হাতুরি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে। আমি সেই এঞ্জিনের বাইরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকি - ক্ষুধার স্টীমে চালিত সজীব হাতুড়িগুলা দুর্নিবার বেগে ছুটিতেছে, ইহাই দেখিতে পাই। ... এই লণ্ডন শহরের সমস্ত গতি, সমস্ত কর্মকে একবার চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি কী ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়।"[২৭]

বহিরাঙ্গিক এই যন্ত্র ও গতি যে ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "আমাদের দেশের তন্দ্রালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্ধেক চোখ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি, ও দেশের চিন্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু, সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয় তখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি তাহার বেগ কতখানি। এ দেশে যাঁহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে

আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ... ইঁহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ; এই জন্য তাহা শিকারীর শিকার ইচ্ছার মতো কেবল মাত্র্ শক্তির খেলা নহে। এইজন্য ইঁহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতা মতো নহে - তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে। ... ইঁহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন জাগিয়া আছে।"[২৮]

পরিবর্তিত ইংলণ্ডের জীবনপ্যাটার্ন এবং পরিবর্তিত নতুন ধারার শিল্প সাহিত্যের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর পড়া কিছু অসম্ভব নয়।

৫.১.৩.৩. নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিজনিত অভিঘাত -

তিন ঃ- বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৫ ই নভেম্বর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ আসে। আমাদের ধারণা, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথকে করে তোলে অধিক আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল। দেশে রবীন্দ্র বিরোধিতার একটা কদর্য আবহ তৈরি হলেও রবীন্দ্রনাথ যতটা সম্ভব নীরব এবং সংযত ছিলেন। এমন সময় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁকে নতুন ধরনের সাহিত্য রচনার ঝুঁকি নিতে সাহায্য করে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন -

"তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে বাংলার কয়েকটি সাময়িক পত্র প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিল যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন। এর উপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'আনন্দ বিদায়' নামে এক ব্যঙ্গ নাটকের অভিনয় করিয়ে কবিকে হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করেন। ... কলকাতায় এসে দেখেন যে, বাইরে থেকে যা অনুমান করে এসেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য।"[২৯]

এমন সময় নোবেল পরস্কার প্রাপ্তি সংবাদ এবং সেই উপলক্ষে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথকে হঠাৎই আক্রমণাত্মক হতে দেখা যায় -

"শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে উৎসব হল (২৩ নভেম্বর, ১৯১৩); নানা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সম্প্রদায় কবিকে মানপত্র দিলেন। সেদিনকার শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে বাঙালির

কোনো কপটতা ছিল না। কিন্তু কবির মনে কী একটা ক্ষোভ ছিল, অকস্মাৎ সেদিন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা অত্যন্ত তিক্ত একখানা চিঠি সেদিনই তাঁর হস্তগত হয়, আর সভায় উপস্থিত এমন কয়েকজনকেও একেবারে সামনে দেখলেন যারা বরাবর কবিকে অনাদর করে এসেছেন। সংবর্ধনার আয়োজনকে কৃত্রিম বলে তাঁর মনে হল। তাই প্রতিভাষণে এমন করা কথা বললেন যাতে কবির ভক্ত অভক্ত সকলেই অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেন। তাঁর ঐ ভাষণ নিয়ে সমসাময়িক কাগজ-পত্রে বহুদিন ধরে বহু আলোচনা চলেছিল। কবি যা বলেছিলেন তা একেবারে মিথ্যা নয়, কারণ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই তাঁর বইয়ের বিক্রি বেড়ে গেল।"[৩০]

বহু বেদনায় ও ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচলিত সংযত রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিভাষণে এমন কড়া কথা' বলার পেছনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিজনিত দীপ্ত আত্মবোধ ক্রিয়াশীল থাকার সম্ভাবনা অমূলক নয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিজনিত এই আত্মবিশ্বাস নতুন ধরনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে ওঠে। যার প্রকাশ ঘটে এর পাঁচ মাস পর (মে, ১৯১৪) প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজ পত্রে, *বিবেচনা ও অবিবেচনা, সবুজের অভিযান, চতুরঙ্গ* প্রভৃতি প্রকাশের মধ্যদিয়ে। রবীন্দ্র জীবনীকারের ভাষায় "রবীন্দ্র সাহিত্যে নতুন পালা শুরু হল 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের এই কবিতা থেকে। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে তারই ভূমিকা ও ভাষ্য।"[৩১] তৎকালীন পাঠক *চতুরঙ্গকে* যে সাদরে গ্রহণ করে নি, তা ঐতিহাসিক সত্য, "চতুরঙ্গ ও ঘরে-বাইরে এ যুগের সাহিত্যিক মহলে কম আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। মোট কথা, এই সব রচনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেক নামজাদা লেখকের কাছ থেকে অনেক রূঢ় বাক্য শুনতে হয়েছিল।"[৩২] *চতুরঙ্গ* যে উপন্যাসের প্রচলিত পাঠাভ্যাসে অভ্যস্ত পাঠকমহল সাদরে গ্রহণ করবে না, তা রবীন্দ্রনাথের অজানা থাকবার কথা নয়, তবু তিনি চতুরঙ্গের মত দুঃসাহসিক সৃজনে অগ্রসর হলেন, এর পেছনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিজনিত আত্মবিশ্বাস, দায়িত্ববোধের ভূমিকা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

৫.১.৩.৪. বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত -

চার ঃ- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই যদিও *চতুরঙ্গ* রচিত, তবু বিশ্বযুদ্ধের আভাসজনিত একটা অনিকেত মনোভাব সম্ভবত এই পর্যায়ে রচিত সাহিত্যধারার পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সতত সজাগ রবীন্দ্রনাথ তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাসে শঙ্কিত হয়েছিলেন বলেই সম্ভবত এ সময় আসন্ন এক অমঙ্গল ও সর্বনাশের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্র-মনন। বেদনাদীর্ণ, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত রবীন্দ্রনাথ ১৭ মে, ১৯১৪ তে এনড্রুজকে লেখন - "I have been experiencing the feeling at a great expectation, although it has also its elements of very great suffering. To be born naked in the hear of the eternal truth, to be able to feel with my entire being the life throb of the universal heart - that is the cry of my soul." ২১ মে ১৯১৪ তে পুনরায় লেখেন - "I am struggling on my way through wilderness. My feet is bleeding and I am toiling with panting breath, wearied I lie down upon the dust and cry and call upon His name. I know that I must pass through death. God knows it is the death pang that is tearing open my heart."[৩৩]

এই সময় রচিত হয় *সর্বনেশে, আহ্বান* ও *শঙ্খ* কবিতা তিনটি (রচনাকাল, ৫, ৬, ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) *সর্বনেশে* কবিতায় লেখেন -

"এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ওই বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।”[৩৪]

এই সর্বনেশে কি মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে যদিও জানিয়েছেন, “আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্‌বেগ ছিল ...।”[৩৫] *শঙ্খ* কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তাতে যুদ্ধের পূর্বাভাসই স্বীকৃত হয়েছে।

“তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।”[৩৬]

এই কবিতার কবিকৃত ব্যাখ্যা - “এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনো যুদ্ধ শুরু হতে দু মাস বাকি আছে। তার পর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সর্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। ... আরো ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে কাল সর্বজাতির লোকের। ... শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমাঁ রোলা বার্টান্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে

দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সর্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।"[৩৭]

বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস রবীন্দ্রমনে অমঙ্গল আশঙ্কার যে রক্তিম মেঘ ঘনীভূত করে তুলেছিল, সভ্যতা সম্পর্কে যে নৈরাশ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করছিল, এই সার্বিক বিপর্যয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় খুঁজে পান উপনিষদের মহামন্ত্রে। শচীশের জীবন-জিজ্ঞাসার মূলেও যা ক্রিয়াশীল। স্বদেশী আন্দোলনের অবসানজনিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর করুণ অবনমন, আন্দোলনে জড়িত যুবসমাজের উদ্দেশ্যহীন জীবন যন্ত্রণা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস, যে নেতিবাদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছিল আরও, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এর প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়েছে। "চতুরঙ্গ উপন্যাস যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা তাঁর সাধের মানববিশ্বকে তখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এর প্রতিক্রিয়া নানাজনের নানাভাবে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে খুব বড়ো একটা সংকট তৈরি হয়েছে বিরূপ বিশ্বে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ মানুষের অবস্থান আর তার আত্মস্বরূপের সন্ধান নিয়ে।"[৩৮] দৈশিক ও বিশ্বগত এই সংকটের উপশম রবীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন উপনিষদের মধ্যে, উপনিষদের প্রবাদ প্রতিম উচ্চারণ 'আত্মানাং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জানো - চতুরঙ্গ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবসত্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের নিত্য ধ্যানের মন্ত্র- "ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্। (অমৃতরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। তিনি শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয়) এবং অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোহর্মামৃতং গময়। অবিরাবিমি এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম। (অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে প্রকাশ আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক। রুদ্র তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা কর)' এই দুটি ঔপনিষদিক মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয়স্থল রূপে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ১৯১০-এর ৩০ নভেম্বর এন্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা কালে রবীন্দ্রনাথ এই দুটি মন্ত্রের মর্মার্থ বুঝিয়ে

দেন, যা তাদের শুভযাত্রা পথের পাথেয় হয়ে রয়।[৩৯] বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সার্বিক অমঙ্গল আশঙ্কার দিনেও এই দুটি মন্ত্রের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ উপশম খুঁজেছেন যেন। শচীশের আত্মানুসন্ধানে এই বোধ ক্রিয়াশীল। এর সাথে মিশেছিল ইংলণ্ডের মর্মমূলআহৃত জীবনজিজ্ঞাসা এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিজনিত দায়িত্ববোধ ও আত্মবিশ্বাস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো দার্শনিক প্রতিবেদন রচনা করতে চান নি, তিনি চেয়েছেন, চতুরঙ্গের মধ্যদিয়ে দর্শনকে উপন্যাসের শিল্পরূপ দিতে। এক্ষেত্রে তাই তাঁকে অনিবার্যভাবেই পাড়ি দিতে হয়েছে নতুন তট সীমায়।

- ২ -

৫.২. প্রাকরণিক অভিনবত্ব -

আকরণ ও প্রকরণগত দিক দিয়ে *চতুরঙ্গ* সেদিনের বাংলা উপন্যাসের ধারায় এতটাই অভিনব ছিল যে, অভ্যস্ত সংস্কার থেকে সমালোচকেরা চতুরঙ্গের ঔপন্যাসিকতার প্রশ্নে আতান্তরে পড়েন। উপন্যাসটির প্রকাশের ব্যতিক্রমধর্মীতাও এর অন্যতম কারণ। সবুজপত্রের চারটি সংখ্যায় 'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ', 'দামিনী', ও 'শ্রীবিলাস' নামে চারটি গল্প ছাপা হয়, চারটি গল্প একত্রে *চতুরঙ্গ* নাম দিয়ে একটি অখণ্ড উপন্যাস রূপে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। 'পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি অখণ্ড উপন্যাসের চতুরঙ্গ রূপে গল্প চারটি লেখা হয় নি; লেখা হতে হতে গল্পগুলি একটি উপন্যাসের চতুরঙ্গ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো উপন্যাসের জন্ম এভাবে হয় নি।'[৪০]

৫.২.১. সমালোচনার আবর্তে চতুরঙ্গ -

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের 'উপন্যাস' শীর্ষক পরিচ্ছেদে চতুরঙ্গের আলোচনা না করে, 'রূপক' শীর্ষক স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে (একাদশ পরিচ্ছেদ) চতুরঙ্গের আলোচনা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে -

"সাঙ্কেতিক রচনা ... বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্পের উৎকর্ষের সবচেয়ে বেশী পরিচয় পাই সেই সকল রচনায় যেখানে সাঙ্কেতিকতা সাধারণ সুখ-দুঃখের কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। এই সংমিশ্রণের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ দেখিতে পাই 'চতুরঙ্গ' গদ্যকাব্যে।"[৪১]

আধুনি সাহিত্যধারার অন্যতম প্রবক্তা বুদ্ধদেব বসু বলেছেন -

"চতুরঙ্গ পড়তে পড়তে সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তি কি অনুভব করি না আমরা, কেমন হাঁপ ধরা ভাব, যেন বড়ো বেশি পাতলা হাওয়ার বই?"[৪২]

বিশ্বপতি চৌধুরী চতুরঙ্গকে খাঁটি উপন্যাস বলে স্বীকার করেন নি।

"খাঁটি উপন্যাস বলতে সাধারণতঃ যে শ্রেণীর রচনাকে বুঝায়, চতুরঙ্গ ঠিক সে শ্রেণীর নয়।"[৪৩]

প্রমথনাথ বিশী *চতুরঙ্গকে* উপন্যাসের হিসাবের মধ্যে ধরেন নি। *চতুরঙ্গকে* তাঁর মনে হয়েছে 'খণ্ডোপন্যাস'।

"চতুরঙ্গের পৃ. সংখ্যা ১২৩; কিন্তু এই তালিকায় তাহার উল্লেখ না থাকিবার কারণ ও বইখানা পুরা উপন্যাসও নয়, আবার রীতিমতো ছোটগল্পও নয়; উপন্যাস ও ছোটগল্পের গাঁটছড়া বাঁধিয়া ওখানা রচিত, উহাকে বর্তমান হিসাবে ধরিলে চলিবে না।"[৪৪]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *চতুরঙ্গকে* আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে করেছেন।

"রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাসসমূহের মধ্যে 'চতুরঙ্গ' সর্বাপেক্ষা আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary), ইহার অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ভাবগভীরতার পরিবর্তে লঘু ও দ্রুতসঞ্চারী চটুলতার সহিত আলোচিত হইয়াছে।"[৪৫]

তাঁর আরও মনে হয়েছে -

"যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটিকে অস্থির পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা বিবর্তিত করিতেছে।"

রথীন্দ্রনাথ রায় *চতুরঙ্গকে* 'বিশেষ আইডিয়া বা তত্ত্বের রসমূর্তি হিসেবে' দেখেছেন -

"সার্থক উপন্যাস হিসেবে সাধারণ বিচারে এর ঔপন্যাসিক গুণের অপূর্ণতা সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু বিশেষ আইডিয়া বা তত্ত্বের রসমূর্তি হিসেবে এই উপন্যাসটির একটি স্বতন্ত্র ও অখণ্ড রসাস্বাদন সম্ভব।"[৪৬]

নীহাররঞ্জন রায় *চতুরঙ্গকে* 'সুন্দর ও সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি বলে স্বীকার করে নিলেও *চতুরঙ্গকে* তিনি মহৎ উপন্যাস বলে গ্রহণ করতে পারেন নি -

"ইহার বস্তুভূমির গভীরতা আছে, কিন্তু প্রসার নাই; মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গলীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবনদর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপন্যাসে লাগে নাই।"[৪৭]

চতুরঙ্গের মধ্যে তিনি একমাত্রিকভাবে মানব হৃদয়ের বিচিত্র প্রেমের রূপ লক্ষ্য করেছেন -

"মানব জীবনের একটি প্রধান চিত্তবৃত্তি প্রেম; একটি বিশেষ কালের একটি বিশেষ জীবনদর্শনের বিশেষ কয়েকটি আবেষ্টনের বিচিত্র বিরোধী সংস্থানের মধ্যে সেই প্রেমের রূপ ও লীলা কত গূঢ় কত বিচিত্র, কত বর্ণময়, কত রহস্যময় হইতে পারে তাহারই মনন-কল্পনা লইয়া চতুরঙ্গ উপন্যাস।"[৪৮]

৫.২.২. আমাদের পাঠে চতুরঙ্গের অভিনবত্ব -

চতুরঙ্গের বিরূপ সমালোচনার দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করে এই গবেষণাপত্রের কলেবর বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্ধৃত সমালোচনাংশগুলি অন্ধের হস্তিদর্শনের রূপকের মতোই আংশিকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে হওয়ায় এবং *চতুরঙ্গ* সম্পর্কে আমাদের ধারণা উদ্ধৃত কোনো মতেরই অনুসারী নয় বলে *চতুরঙ্গ* সম্পর্কে পূর্বজদের সমালোচনার ধারা ফিরে দেখার প্রয়াস করা হল। এক্ষেত্রে আমাদের ধারণা *চতুরঙ্গ* সর্বার্থেই একটি সার্থক উপন্যাস।

বস্তুতঃ চতুরঙ্গের শিল্পোৎকর্ষ নিয়ে সংশয় ও সন্দেহের প্রধান কারণ, উপন্যাসের উপকরণ ও প্রকরণ সম্পর্কিত প্রথাগত রীতি ও ধারণার প্রতিফলন চতুরঙ্গে প্রত্যাশা করা। এই গবেষণাপত্রের

প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করেছি *আঁতের কথা* প্রকাশের তাগিদে রবীন্দ্র উপন্যাস কিভাবে বঙ্কিমী ঘটনাপ্রাধান্য পরিহার করে ক্রমশঃ চরিত্র-প্রধান হয়ে উঠেছে। গল্প জমাবার জন্য ঘাটনিক বাস্তবতা নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতাই যে রবীন্দ্রনাথের মনোযোগের কেন্দ্রে এসেছিল - তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বের জন্যই উনিশ শতকী প্লটের মোহ ঘুঁচিয়ে নিজস্ব একটি উপন্যাসশৈলী তৈরি করে নিচ্ছিলেন। *চোখের বালি* থেকে এই নবরীতি অনুসৃত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে অভ্যস্ত মন *চোখের বালি* সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছে। *গোরার* যাত্রাপথও খুব মসৃণ ছিল না। *গোরার* প্রকাশকালেই সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন -

> "প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরা নামক বিতর্কবাদ বা উপন্যাস। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তত বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, গোরা নামক ফনোগ্রাফেও সেই সকল পুরাতন 'গৎ' বাজিতেছে। ... রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে জগতের বহু তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে যে তর্কজালের উদ্ভব হইয়াছে, পাঠকের মন নিতান্ত নাচারভাবে সেই লূতাতন্তজালে জড়াইয়া যাইতেছে।"[৪৯]

ঘটনাপ্রাধান্য পরিহারের যে প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল *চোখের বালি* থেকে, চতুরঙ্গে সেই প্রক্রিয়া যেন পূর্ণতা পেয়েছে। মগ্নচৈতন্যের বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে শিল্পরূপ দেওয়ার তাগিদে সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টি পরিহার করে ঘটনা বলার দায়িত্বত্ত চরিত্রের ওপর ন্যস্ত করেছেন। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঘটনার মুখাপেক্ষী কোনোদিনই না থাকলেও *গোরা* পর্যন্ত ঘটনার একটা স্বাভাবিক গতি তিনি বজায় রেখেছেন। চতুরঙ্গে সেই ঘটনাপ্রবাহকে একেবারেই পরিহার করেছেন। স্থান-কালের Chronology সম্পর্কিত ধারণারও বিপর্যয় ঘটিয়েছেন চতুরঙ্গে।

৫.২.২.১. উপন্যাস - না-উপন্যাস ও চতুরঙ্গ -

চতুরঙ্গের উপকরণের জন্য প্রকরণের এহেন নতুনত্ব কতটা আবশ্যক ছিল, সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। বরং এখন আমরা লক্ষ্য করতে পারি *চতুরঙ্গ* কিভাবে বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করেছে। কোনো সর্বজনগ্রাহ্য একমাত্রিক সংজ্ঞায় উপন্যাসশিল্পকে বেঁধে রাখা

যায় না। 'উপন্যাসের সম্ভাবনা অনন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপধ্যায়ের 'আরণ্যক'ও উপন্যাস। স্কটের ওয়েভারলি উপন্যাসগুলি যেমন স্বীকার্য, তেমনি জাঁ পল সার্ত্রের 'লে শেয্যাঁ দ্য লা লিব্যার্তে'ও গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ উপন্যাসের অন্তরদেবতা একব্রতী নন, তিনি বহুবল্লভ।'[৫০] জে.বি. প্রিস্টলের মতে -

> "Coming into existence to please an increasingly varid number at readers, novels, good novels too. Can be at various kinds a statement that only the narrowest and most into lerant critic of fiction would deny."[৫১]

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের যে আদলটি তৈরি করে দিলেন, এবং সেটাই উপন্যাস বিচারের মানদণ্ড হিসেবে একমাত্রিক ভাবে গৃহীত হওয়ার ফলে ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস মাত্রেই বিতর্ক ও সন্দেহের শিকার হয়েছে। এই বোধ থেকেই ত্রৈলোক্যনাথের *কঙ্কাবতী*র মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পান নি। অথচ উপন্যাসের শিল্পরূপের মধ্যেই এক ধরনের flexibility আছে, যার ফলে সময়ের স্রোতে পরিবর্তিত হতে হতে নির্দিষ্ট কোনো একটি রূপ বা সংজ্ঞার নিগড়ে উপন্যাস আজ বন্দি নেই আর। উপন্যাসের যাত্রপথ তাই সর্বদাই অনিশ্চিত ও অভাবিত। "উপন্যাস পড়তে পড়তেই ত আমাদের ভিতরে উপন্যাসের সংজ্ঞা তৈরি হয়ে ওঠার কথা। এমন-কি প্রথম যে ঔপন্যাসিকরা উপন্যাস বা গল্প লেখেন তাঁরাও তো লিখতে লিখতেই উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞাটি নিজের কাছে তৈরি করে নেন। সংজ্ঞা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান বা স্থির ধারণা থাকে না বলেই ত উপন্যাস বা গল্প, বা যাকে আমরা গদ্যকাহিনী বা কথাসাহিত্য বলি, তার বিকাশের প্রক্রিয়াটি হয়ে ওঠে অভাবিত ও অনিশ্চিত অথচ তার চরিত্র বা সংজ্ঞা তারই মধ্যে এক ধরনের স্পষ্টতা পেতে থাকে।"[৫২] অপরদিকে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যে উপন্যাস সৃষ্টি হল, তার মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা বা দ্বিধা ছিল না। তাঁর সামনে ছিল ঘটনামুখ্য পাশ্চাত্য উপন্যাসের একমাত্রিক মডেল। "বাংলা গল্প উপন্যাসকেও হয়তো সেই অভাবিত ও অনিশ্চিত

পথে বিকশিত হতে হচ্ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বা কাহিনীগদ্যের যে ধরনটি, যে ফর্মটি প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ভিতর কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না, কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। কারণ, তাঁর কাছে ইয়োরোপীয় উপন্যাসের মডেলটিই ছিল একমাত্র মডেল।"[৫৩]

বঙ্কিমচন্দ্র যাকে উপন্যাস মনে করতেন, সেই ধরনটিই বাংলা উপন্যাসের মূলধারা হিসেবে চর্চিত হওয়ায় সমালোচকমন ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাসের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস বলতে যা বুঝতেন এবং যে উপন্যাস তিনি তৈরি করলেন, তাতে জীবনের সব ভার যে সয় না, সে সম্পর্কে তিনি ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠছিলেন বলে মনে হয়। তাই 'এই জীবন লইয়া কি করিব'- এই প্রশ্নের উত্তর তাঁকে খুজতে হল *কমলাকান্তের দপ্তরএ*। অপরদিকে বিরূপ বিশ্বে একাকী মানুষের এই একই জিজ্ঞাসার শিল্পরূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপন্যাস শিল্পরূপের বিনির্মাণ ঘটিয়ে লিখতে হল *চতুরঙ্গ*। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন - "ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়।"[৫৪] *চতুরঙ্গ* রচনার সমসাময়িক কালে পাশ্চাত্যে চেতনাপ্রবাহকে উপন্যাসের উপজীব্য করে উপন্যাসের প্রচলিত ধারণা বদলে দিয়েছিলেন। বাংলায় সেই কাজটি করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৪ তে জেমস্ জয়েস তাঁর *ইউলিসিস* লেখা শুরু করেন, যেখানে তিনি 'আত্মোক্তি-প্রবাহ' (monologue) ব্যবহার করেন। এই একই সময়ে ডরোথি রিচার্ডসন *পয়েন্টেড রুফস্* লেখেন যা চেতনাপ্রবাহ (Stream of consciousness) রীতির সার্থক দৃষ্টান্ত। চতুরঙ্গেরও সৃষ্টি এই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। যেখানে রবীন্দ্রনাথ আত্মোক্তিপ্রবাহ বা চেতনাপ্রবাহ কোনোটিরই বিবরণ দেন নি, বরং শ্রীবিলাসের জবানিতে শচীশের চেতনার নানা স্তর ও বিভঙ্গ কখনো সরাসরি কখনো পরোক্ষে জ্ঞাপন করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন -

> "১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের কামান গর্জে উঠল বটে, কিন্তু বিশ্ব উপন্যাসের পক্ষেও এই বৎসর এক ক্রান্তিকাল। ... মনে হয় ১৯১৪ সাল যেন বিশ্বমানবের অন্তরে বাইরে এক বিপুল বিপ্লব নিয়ে দেখা দিয়েছিল - তা কেবল যুদ্ধ সীমান্তই নয়, সাহিত্য সীমান্তেও বটে। সেই বিপ্লবের দুন্দুভি ইয়োরোপে বসে শুনেছিলেন প্রুস্ত্-জয়েস-

ডরোথি-এম.আর, বাংলাদেশে বসে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নতুনকালের উপন্যাসই লিখেছেন - চোখের বালি কিংবা গোরার অনুবর্তন করেন নি।"[৫৫]

- ৩ -

৫.৩. পুনঃপাঠের আলোকে শচীশ -

চতুরঙ্গ শ্রীবিলাসের জবানিতে বিবৃত শচীশের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। ইতিহাসের দিক থেকে আধুনিকতার সূচনাকাল হিসাবে ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়। ইংলন্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে বিজ্ঞান ও অর্থনীতির যে নতুন বিস্তার ঘটল, তা সভ্যতার আধুনিকতা হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লব ছাড়াই পাশ্চাত্য শিক্ষার হাত ধরে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেই 'বকচ্ছপ' ধরনের যে জীবনবোধের সঞ্চার ঘটল, তা আধুনিকতার শিরোপা পেয়ে গেল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিল্পবিপ্লবজাত আধুনিকতার সংকট প্রত্যক্ষ করে এলেন। যেখানে রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী প্রবর্তনা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ততদিনে নিঃশেষিতপ্রায়। প্রবল অর্থনৈতিক অসাম্যে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মূল্যবোধের অবক্ষয় সূচিত হয়েছে।[৫৬] দেশে ফিরে এসে দেখলেন স্বদেশী আন্দোলনের অবসানের দরুন সৃষ্ট শিক্ষিত তরুণসমাজের অনিকেত জীবনজিজ্ঞাসা। বিশ্বযুদ্ধের সর্বাত্মক অমঙ্গলের আশঙ্কা এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তোলে। এ-সবের জটিল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় নবজাত রবীন্দ্রচেতনা শচীশের সৃষ্টিভূমি। সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃতযোগ্য -

"নিয়ত অস্থির মানুষের সত্তা যখন কোথাও অন্বয়ের সূত্র খুঁজে পায় না, অনন্বয়ের দহন তার উদ্‌ভ্রান্তিকে আরো বাড়িয়ে তোলে - সেসময় জগতের সঙ্গে ভেতরে ও বাইরে সংঘর্ষের মধ্যদিয়ে তাকে চলার পথ ও সন্ধানের অবলম্বন নির্মাণ করে যেতে হয়। বিশ শতকের আত্মঘাতী আধুনিকতা যখন নাস্তির নৈরাজ্য আর মূল্যবোধের সার্বিক ক্ষয়কে প্রাথমিকতা দিচ্ছে, সে সময় নীৎসে কথিত ধ্বংসের বিশ্বরূপ দ্বারা

আক্রান্ত ব্যক্তিসত্তা এবং তার নিরন্তর সংগ্রাম উপন্যাসের বিষয় হবে না কেন? কোনো উপন্যাসে কেবল বহির্বৃত আকরণ আর নিটোল কাহিনীর গ্রন্থনা থাকবে, এই ধারণাও তো বিনাশবাদের লক্ষ্যহীন যাত্রার প্ররোচনায় বদলে যেতে বাধ্য। চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ সত্তার আত্মনির্মিতিকে শিল্পরূপ দিয়েছেন।"[৫৭]

১৩২১ - এ রবীন্দ্রনাথ লেখন -

"সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।

এক সময়ে জিনিসই ছিল বৈশ্যের সম্পত্তি, এখন মানুষ তার সম্পত্তি হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাবেক-কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত কী তাহা বুঝিয়া দেখা যাক। সে আমলে যেখানে রাজত্ব রাজাও সেখানেই - জমাখরচ সব এক জায়গাতেই।

কিন্তু এখন বাণিজ্য প্রবাহের মতো রাজত্ব প্রবাহেরও দিনরাত আমদানি রফতানি চলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নূতন কাণ্ড ঘটিতেছে - তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিল না। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।"[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ, এখানে যে 'গান্ধর্ব বিবাহ' সংবাদ দিয়েছেন সেটা সাধারণত 'অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদ' নামে পরিচিত। তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলি বেশির ভাগই বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রাক্তন উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশ ছিল রাজনৈতিক ভাবে। কিন্তু অর্থনৈতিক ভাবে এখনও উপনিবেশ রূপেই রয়ে গেছে। বরং সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বায়নের নামে নয়া উপনিবেশবাদ আরও প্রবল হয়েছে। বাজার অর্থনীতির আধিপত্যে 'নিয়ন আলোয়' সব ব্যক্তিগতই যখন আজ পণ্য হয়ে উঠেছে, বৌদ্ধিক স্বাধীনতাহীনতায় বেঁচে থাকা যখন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে ক্রমশঃ এবং আধুনিকতার নামে একটা ছকে গড়া জীবে পরিণত করার চেষ্টা চলছে অবিরত; বাজার অর্থনীতির

বিবিধ উপকরণ যখন আমাদের নিঃসমাজ জীব বানিয়ে পরিণামে অবসাদের কৃষ্ণগহ্বরে নিমজ্জিত করছে এবং যখন -

"নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয় -
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত - ক্লান্ত করে ...।"[৫৯]

এই গভীর ক্লান্তি যখন 'এক গাছা দড়ি হাতে' আত্মহননের মধ্যদিয়ে মুক্তি খোঁজে, তখন চতুরঙ্গের পুনঃপাঠ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। শচীশের মধ্যে যেন এই বোধেরই পূর্বছায়া। যে বোধ থেকে -

"সব কাজ তুচ্ছ হয় - পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা-প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়
শূন্য মনে হয়।"[৬০]

শচীশের মধ্যে এই বোধেরই উৎস। যে বোধ থেকে শচীশও হয়তো উপলব্ধি করেছে -

"সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?"

এই বোধ থেকেই শচীশ জীবনের নির্দিষ্ট কোনো একটা অপরীক্ষিত ছকে বাঁধা থাকতে চায় নি। নিজেকে জানার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি বৃত্ত থেকে সরে এসেছে অপর একটি বৃত্তে। আর চলমানতাই যেহেতু জীবনের ধর্ম, থেমে যাওয়া মৃত্যুরই নামান্তর, তাই শচীশের মধ্যদিয়ে জীবনের

এই হয়েওঠার প্রক্রিয়াই আভাসিত হয়েছে। কিন্তু জীবনতত্ত্ব ও উপন্যাসতত্ত্ব যেহেতু এক নয়, তাই শচীশকে তাঁর সকল উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে বাস্তবের কর্মক্ষেত্রে স্থিত হতে হয়েছে।

> "একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তারপরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না। তার পরে আর-একদিন এই সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল - কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহা দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।"(দামিনী, পরিশিষ্ট)

অর্থাৎ শচীশের আত্মানুসন্ধান যতই বিমূর্ত হয়ে উঠুক না কেন, পরিণামে 'কী মানিল আর কী না মানিল' তা বোঝা না গেলেও এটুকু বোঝা যায় যে, 'আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে', এবং তার মধ্যে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে, কেননা 'তার মধ্যে ঝগড়া বিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই'। শচীশের পরিণাম সম্পর্কে এর থেকে বেশি কিছু জানা যায় না। বস্তুতঃ শচীশ চেয়েছে পরমার্থের উপলব্ধি, সে চেয়েছে এমন সত্য, যা পেলে ঘটবে তার আত্মবিরোধের মীমাংসা। সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসাসূচক অবসান ঘটিয়ে পরিণামে সে কোন নির্দিষ্ট জীবনবৃত্তে স্থিত হল, তা দেখানো ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল না বলেই পরিণামে শচীশ 'কী মানিল আর কী না মানিল' তা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি। যা নির্দিষ্ট হলে এক মুহূর্তে ভেঙে পড়ত গোটা উপন্যাসের ভরকেন্দ্র। কোনো একটা নির্দিষ্ট জীবনবোধের প্যাটার্নে বদ্ধ হওয়ার তথ্য পরিবেশিত হলে শচীশের প্রসারণশীলতা রুদ্ধ হয়ে যেত ভবিষ্যতের পাঠকের কাছে।

'আগেকার মতো সে কাজে লাগিয়া গেছে' জন্য পরিণামে শচীশ 'সাধনার বাষ্পে ভরা উন্মার্গগামী বেলুনের মতো মহাশূন্যে উধাও হইয়া গিয়াছে',[৬১] এমন প্রতীতি সমর্থিত হয় না। 'সাধনার বাষ্পে ভরা উন্মার্গগামী বেলুনের মতো মহাশূন্যে উধাও হইয়া' গেলে একদিকে যেমন

চতুরঙ্গের ঔপন্যাসিকতা সংকটের সম্মুখীন হত, তেমনি আর একদিক দিয়ে ধ্বস্ত হত মানুষের সম্পর্কে রবীন্দ্র প্রত্যয়। যে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন -

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"[৬২]

তাঁরই সৃষ্ট নায়ক যদি পরিণামে নিঃসঙ্গতা-নৈষ্কর্ম ও বৈরাগ্যের পথ নিত, তবে তা হত রবীন্দ্রনাথের আজীবন মানবপ্রেমের এক শোকাবহ করুণ পরিণতি। নির্জন চরে কিংবা ঝড়ের রাতে শচীশ আত্মমগ্ন হলেও দামিনী শ্রীবিলাস সকলকেই সে এক সময় প্রত্যাখ্যান করলেও পরিণামে শচীশ কোনো নিঃসীম শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায় নি। সে স্থিত হয়েছে জীবনের বৃত্তে, কাজের বন্ধনে। আমাদের এই ধারণার সমর্থনে গবেষক অমরেশ দাশের সুচিন্তিত মূল্যায়ন উদ্ধৃত করা যায় -

"যে লেখকের সকল ভাবনা, কল্পনা ও তৎপরতা মানুষকে ঘিরে, এমনকী যাঁর ঈশ্বর পর্যন্ত মানুষের প্রত্যাশী, তিনি কি তবে এই বইতে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই প্রাচীন ও অভেদ্য গোলক-ধাধাঁর কথা শোনালেন যেখানে জীবন নেই কিন্তু আছে জীবনসত্যের সন্ধানে নিষ্ফল মাথা-কোটা? তা যদি হয় তবে সে-তো রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় এক শোকাবহ স্খলন! অবশ্যই সেরকম কিছু ঘটে নি! একটু খুঁটিয়ে ও খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, 'আত্মদীপ' হয়ে যতদিন না শচীশ তার আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার নিরসন ঘটাতে পেরেছে, ফিরে পেয়েছে চিত্তের স্থৈর্য, ততদিনই তার নিঃসঙ্গতা ও মানুষের প্রতি ঔদাসীন্য। অবশেষে সে ফিরে এসেছে মানুষের মাঝে এবং মানুষের কাজে।"[৬৩]

শচীশের এই পরিণাম না দেখিয়ে নিঃসীম শূন্যতায় নিষ্ক্রমণ তার পরিণতি হলে, শচীশের সাথে খুব একটা পার্থক্য থাকত কি অমীমাংসিত দ্বন্দ্বজর্জর আজকের মানুষটির, যার

"মাথার ভিতরে

স্বপ্ন নয় - প্রেম নয় - কোনো এক বোধ কাজ করে।”[৬৪]

কিংবা যে মানুষটির

“কাল রাতে - ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ

মরিবার হ’লো তার সাধ;”

অথচ যার

“বধূ শুয়েছিলো পাশে - শিশুটিও ছিলো;

প্রেম ছিলো - আশা ছিলো -”[৬৫]

শচীশের আত্মানুসন্ধান তাই আজকের অন্ধ-শতচ্ছিন্ন সময়ের মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে। কেননা -

“মধ্যবিত্তমদির জগতে

আমরা বেদনাহীন - অন্তহীন বেদনার পথে” চললেও

“আরমা কি তিমির বিলাসী?

আমরা তো তিমিরবিনাশী।

হ’তে চাই।

আমরা তো তিমির বিনাশী।”[৬৬]

এক্ষেত্রে স্থান-কালের নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক ডিটেলিঙের প্রতি ঔপন্যাসিকের সচেতন বিবিক্ততা যে কোনো কালে যে কোনো ভৌগোলিক পরিসরে শচীশের প্রতিস্থাপকতায় সহায়ক হয়েছে।

“গেলাম লীলানন্দস্বামীর খোঁজে। কত নদী পার ইহলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।” (শচীশ - ৩) কিংবা

> "সেদিন প্রায় ছয় ঘন্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে।" (শচীশ - ৯)

পরিশ্রমী পাঠক এই বর্ণনা থেকে স্থান-কালের নির্দিষ্টতাসূচক কোনো সূত্র খুঁজে পেলেও আমাদের পাঠে, তা প্রয়োজনহীন।

এক্ষেত্রে আমাদেরও বিশ্বাস "চতুরঙ্গ উপন্যাসের প্রতিবেদন সম্পর্কিত ধারণারই খোলনলচে পাল্টে দিতে চেয়েছে। বাইরের ঘটনা কিংবা ভৌগোলিক পরিসর এখানে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়; সত্তা ও অপরতার দ্বিবাচনিতাকে স্থানিক ও কালিক পরিচয়ে বিধৃত করার জন্যে যতটুকু না জানালেই নয়, সেই অপরিহার্যকে কেবল ইশারায় ও রূপরেখায় হাজির করেছেন রবীন্দ্রনাথ।"[৬৭] আবার চতুরঙ্গ যেহেতু উপন্যাস, কোনো শুষ্ক দার্শনিক প্রতিবেদন নয়, তাই নির্দিষ্ট স্থান-কালের থেকে মুক্ত হয়েও বিমূর্ত কখনোই মূর্তকে পুরোপুরি ছাড়ে নি, 'মূর্ত ও বিমূর্তকে একই সঙ্গেঁ ছুয়ে থাকে উপন্যাসের প্রতিবেদন।'

উপন্যাসে দেশ-কালের পটে চরিত্র বিচার করা হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দেশ-কাল যেন চরিত্রের ধাত্রী। চতুরঙ্গে এই প্যাটার্নটিও যেন উল্টে গেছে, এখানে চরিত্রই যেন দেশ-কালের ধাত্রী। শচীশ-দামিনীর যন্ত্রণা যে কোনো দেশ-কালে প্রতিস্থাপকতা পেয়ে যায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ভূদেব চৌধুরীর সুচিন্তিত মন্তব্যে, "সন্দেহ নেই, ব্যক্তির 'আঁতের কথা'ই রবীন্দ্র উপন্যাসের চিরকালের উপজীব্য; গোরা পর্যন্ত ছিল সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ; চতুরঙ্গ থেকে নিঃসমাজ ব্যক্তির। আর ঐ ব্যক্তিত্বের মান ও মাত্রা নিয়েই জীবনের দেশকালগত পরিচয়।"[৬৮]

চতুরঙ্গ মুখ্যতঃ ব্যক্তির নিগূঢ় আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনী (Search for identity)। মনের গহন গভীরে চলতে থাকা ভাঙা-গড়া তৎসম্পর্কিত বর্ণিত পরিবেশের সাথে একাত্ম হয়ে পরিবেশিত হওয়ায় পরিবেশ এক্ষেত্রে গূঢ় সংকেতের ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে উঠেছে। যেমন ঃ

ক ঃ- গুহাদৃশ্যের ছায়াচ্ছন্ন স্যাঁৎসেতে পরিবেশ শচীশের চেতন-অবচেতন সত্তার দ্বিরালাপের প্রতীকী চিত্রকল্প হয়ে উঠেছে।

"সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো - তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন, আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে, সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই - সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে - সে নিঃশব্দে কাঁদে। ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখী, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহির কিংবা বাহির হইতে ভিতরে ঝপঝপ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।" (শচীশ-১০)

খ ঃ- শচীশের প্রতি দামিনীর আত্মনিবেদন সূর্যাস্তের চিত্রকল্পে আভাসিত -

"আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর পরে তিন জনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মতো নত হইয়া পড়িল।" (শচীশ-৯)

গ ঃ- সাধনায় প্রকৃতির সংসর্গ রাখা না-রাখার প্রশ্নে দামিনীকে লীলানন্দের আশ্রম ত্যাগ করার শচীশের পরামর্শের পর বিদ্রোহী দামিনীর বেদনা সমুদ্রের কান্নায় প্রতীকায়িত ঃ

"সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।" (দামিনী-৩)

ঘ ঃ- দামিনীর চোখে ধূ ধূ নদীচরার নৈঞর্থক ধূসর নিসর্গ তার যন্ত্রণাবিদ্ধ শূন্যতারই প্রতীক হয়ে উঠেছে ঃ

"চারি দিকে ধূ-ধূ করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছপালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।" (দামিনী-২)

ঙ ঃ- আত্মজিজ্ঞাসায় ক্ষত-বিক্ষত শচীশের বিক্ষুব্ধ অন্তর্লোক পোড়ো বাড়িতে ঝড়ের অভিঘাতের প্রচণ্ডতায় ব্যঞ্জনাময় অবয়ব পেয়েছে ঃ

"সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারী একটা ঝড় আসিল। ... নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলছল আর আকাশের জলের ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়্‌ মুড়্‌ দুড়্‌ মুড়্‌ করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের

জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হু হু করিয়া চিৎকার করিতেছে।" (দামিনী - ৪)

সবুজপত্রে জ্যাঠামশায় শীর্ষক অংশ প্রকাশের এক বছর পর অগ্রহায়ণ ১৩২২, রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "মানবচরিত্রে যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেইগুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে গল্পে নাটকে চিত্রিত করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্য চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই।"[৬৯] চতুরঙ্গেও চরিত্রভিত্তিই মুখ্য, ঘটনা নয়। আর এক্ষেত্রে আমাদের চমকিত করে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শিল্পকুশলতা।

সর্বজ্ঞ লেখকের উপস্থিতিজনিত যে ডিটেলিং *চোখের বালি*তে ছিল, তা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে চতুরঙ্গে একেবারেই অনাবশ্যক হয়ে উঠেছে। চরিত্রসমূহের ব্যক্তি-স্বরূপ, তাদের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং মানস পরিবর্তন শ্রীবিলাসের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে বিবৃত হলেও শ্রীবিলাস এক্ষেত্রে বিশ্লেষকের ভূমিকা নেয় নি। বিশ্লেষণের বিকল্প হিসাবে সংকেতব্যঞ্জনা, প্রতীকধর্মিতা পাঠকের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। এরফলে পাঠকৃতিতে সৃষ্ট হলগ্যাঙ্ আইজের (Wolfgang Iser) কথিত Gap বা শূন্যায়তন পাঠক অর্থ দ্বারা পূর্ণ করে নিতে পারেন।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাইরের বাস্তবতার প্রতি বিশেষ দায়িত্বশীল না থাকলেও বিষয় যেহেতু আধুনিক মানুষের জীবন বিষয়ক আন্তঃবাস্তবতার রহস্য অন্বেষণ তাই কাহিনীর কার্য-কারণ শৃঙ্খলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লেখক সচেতনভাবে বর্জন করলেও ভাষাবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে শচীশের জীবনার্থ সন্ধানের বিমূর্ত বিষয়টিকে প্রতিদিনের বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসার প্রয়াস চোখে পড়ে। *চতুরঙ্গ* আদ্যন্ত সাধুভাষায় লেখা হলেও[৭০] এই সাধুভাষার কাঠামোর মধ্যেই তা, তাকে, তার, যাতে প্রভৃতি চলিত সর্বনাম পদের অজস্র ব্যবহার, 'সাধুভাষার সঙ্গে যথেষ্ট ইডিয়মধর্মী কথ্য শব্দের বা চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ' (ফস্ করিয়া, পা টেপানো,

পেটমোটা পুরুত-পাণ্ডা, ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা, বেরো, গেছে প্রভৃতি) কিংবা 'চুল উস্কো-খুস্কো, কাপড় ময়লা প্রভৃতি কথ্য বাক্যরীতির'[৭১] প্রয়োগের মধ্যদিয়ে চতুরঙ্গের ভাষাকে দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসার যে প্রবণতা, তা উপন্যাসটির অন্তর্বয়নে গভীর বাস্তবতার সুরটিকেই যেন চিনিয়ে দেয়। যে বাস্তবতা আধুনিক মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা থেকে উৎসারিত।

ভার্জিনিয়া উলফ্ কথিত 'Life is not a series of giglamps symmetrically arranged',[৭২] শ্রীবিলাসের চেতনাস্রোতে বিচ্ছিন্ন অবিন্যস্ত মুহূর্তগুলির জাগরণে লক্ষণীয়। এটাই স্বভাবিক। এ-কারণেই ঘটনাগত ক্রম - বিন্যাস লঙ্ঘিত হয়েছে। যেমন শচীশ অধ্যায়ের শুরুতেই জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, মৃত্যুর বিবরণ এসেছে তার পরে। দামিনীর সাথে শ্রীবিলাসের বিবাহ সংবাদ এবং শচীশ 'কী মানিল আর কী না মানিল' তার সংবাদ দামিনী ও শ্রীবিলাস অংশের মধ্যপর্বে 'পরিশিষ্ট' অংশে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শ্রীবিলাস অংশের সূচনাতেই দামিনীর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়। দামিনীকে দাহ করে ফেরার পথে ভগ্ন নীলকুঠিতে স্মৃতিমেদুর শ্রীবিলাসের চেতনায় শচীশের সাধনা ও দামিনীর সাথে তার বিবাহের অনুষঙ্গ জাগ্রত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ এখানেও জাগ্রত।

শ্রীবিলাসের চোখ দিয়ে আমরা সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। এক্ষেত্রে শ্রীবিলাসের বিশ্বাসযোগ্যতা, তার মোহ মুক্ত দৃষ্টি পাঠকের অভীষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এই কাজটিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করেছেন শ্রীবিলাসকে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র করে। আবার শচীশের আত্মানুসন্ধান যত বিমূর্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে শ্রীবিলাস মনোযোগের কেন্দ্রে এসেছে। অবশেষে শচীশের আত্মানুসন্ধানে হৃদয় নিরাকৃত হয় যখন, তখনই পরিধি থেকে কেন্দ্রে উত্তরণ ঘটে শ্রীবিলাসের। শচীশের প্রভাবে জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করলেও এবং শচীশের টানে লীলানন্দের রস সাগরে অবগাহন করলেও শ্রীবিলাস নিছক শচীশের উপগ্রহ নয়, বরং উপন্যাসের উপান্তে এসে সে হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র, স্বাধীন অস্তিত্ব, সে হয়েওঠে দামিনীর জীবনপিপাসা চরিতার্থের অবলম্বন।

রবীন্দ্র-উপন্যাসধারায় *চতুরঙ্গ* নতুন ধারার প্রথম প্রচেষ্টা হলেও রবীন্দ্রনাথের সদাসতর্ক শিল্পবোধের প্রবর্তনায় আশ্চর্যরকম শিল্পত্তীর্ণ।

- ৪ -

৫.৪. জ্যাঠামশায় ঃ সমাজ ও শিল্পের সূত্রধার -

"এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। 'জ্যাঠামশার' 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।"- উপন্যাসের শুরুতে ঔপন্যাসিকের এই অবতরণিকা রয়েছে। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে গল্প বা কাহিনী শব্দগুলি ব্যবহার করলেও চতুরঙ্গের ক্ষেত্রে 'বইখানি'র উল্লেখ করেছেন, যা গল্প বা কাহিনীরসের থেকে সচেতন বিবিক্ততার পরিচায়ক। উপন্যাসটির চারটি অংশ থাকার জন্যই যে এর নামকরণ *চতুরঙ্গ*, এমন সরলিকরণ উপন্যাসটির প্রতি সুবিচারের পরিচায়ক নয়। চতুরঙ্গের নামকরণ প্রসঙ্গে তিনটি মত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক ঃ- "যুদ্ধের চারটি যুদ্ধোপকরণ থাকে, তা থেকে চতুরঙ্গ নামটি। চারটি হচ্ছে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক। এই চারটি দিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা হয়। তা হলে সত্যকে উদ্ধারের জন্য যে সাধন সমর তাও চতুর্বিধ - জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। এখানে জ্যাঠামশায়কে বোঝা দুষ্কর নয়। তার সত্যোপলব্ধি যুক্তি দ্বারা মানবপ্রেম দ্বারা ও নৈতিকতার দ্বারা, শচীশের যুক্তি, ভক্তি অতিক্রম করে আত্মোপলব্ধির মধ্যে নিজের আপন সত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। ... বিদ্রোহী দামিনী ইন্দ্রিয় চেতনা থেকে প্রেমের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করেছে। প্রেমেই মুক্তি। আর শ্রীবিলাস যখন নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করল তখন সে বুঝল সংসারের বন্ধন, কর্তব্য ও প্রেমে মুক্তি। তা হলে মুক্তির চারটি পথ রবীন্দ্রনাথ চারটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন।"[৭৩]

খ ঃ- "বইখানির প্রধান পাত্র-পাত্রী শচীশ ও দামিনী। শচীশের জীবনের সুস্পষ্ট চারিটি পর্যায়। জ্যাঠামশায়, লীলানন্দ, দামিনী এবং সর্বোত্তীর্ণ অবস্থা। দামিনীর জীবনেও অনুরূপ চারটি

ভাগ বা পর্যায় - গুরু লীলানন্দ, গুরু বিদ্রোহ, শচীশ এবং শ্রীবিলাস। চতুরঙ্গ নাম এই দিক দিয়ে সার্থক।"[৭৪]

গ ঃ- "কেউ কেউ চতুরঙ্গের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন সাংগীতিক স্থাপত্যের ঔপন্যাসিক প্রতিরূপ। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে যেমন আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ - এই চারটে - সুনির্দিষ্ট স্তরের মধ্যদিয়ে সুর ঈপ্সিত সমগ্রতায় পৌঁছায় - তেমনি এই উপন্যাসে চারটি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক আধেয় সমগ্রতার অভিযোজনাকে স্পষ্ট করে তুলেছে । এই চারটে স্তর পরস্পরের থেকে আলাদা হয়েও গভীর ঐক্যসূত্রে অন্যোন্যসম্পৃক্ত এবং সমান্তরালভাবে বহমান। ... ধ্রুপদী সঙ্গীতে গায়ক যেমন একই সঙ্গে সুরের বিস্তার ঘটিয়ে বিভিন্ন পর্যায়কে সম্পূর্ণ করে তোলে আবার নিজস্ব ঘরানার গায়কী অনুযায়ী রাগিনীর অনুভববেদ্য বিশ্লেষণও উপস্থাপিত করে তেমনি শ্রীবিলাসও একই সঙ্গে নিরপেক্ষ ভাষ্যকার ও কথা-গ্রন্থনার অন্যতম কেন্দ্র"।[৭৫]

আমাদের ধারণা, বহুস্বরিক প্রতিবেদন *চতুরঙ্গ* সম্পর্কে এই তিনটি মূল্যায়নই কোনো না কোনো ভাবে যথার্থ। উল্লিখিত তিনটি মূল্যায়নকে শিরোধার্য করে আমরা চতুরঙ্গের পাঠকৃতিতে প্রবেশ করতে পারি। জ্যাঠামশায় অংশ চতুরঙ্গের প্রবেশক। জ্যাঠামশায় জগমোহন পাশ্চাত্য দর্শন-সাহিত্য মন্থনজাত আলোকে আলোকিত। "ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজী বই দিয়া ঘেরা।" (জ্যাঠামশায় - ২) নাস্তিক জগমোহন মানুষকেই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞানে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। উনিশ শতকের হরিমোহন-পুরন্দরের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত সমাজ-মানসিকতার সাথে জগমোহনের তাই কিছুতেই অন্বয় হয় না। জগমোহনের মৃত্যু 'যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল' সেই ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ দেখা যাছে উনিশ শতকের প্রান্তবেলায়, বিশ শতকের উদয়াচলের মুহূর্তেও ঔপনিবেশিক বাংলায় একাধারে দুটি সময় পাশাপাশি সহাবস্থান করছিল, একটা জগমোহনের সময় এবং অপরটি বহুব্যাপ্ত রহিমোহন-

পুরন্দরের সময়, যা আজও বহমান। "চতুরঙ্গে মুঠো করে ধরবার মত ঘটনা যা কিছু, সে ঐ জ্যাঠামশায় অধ্যায়েই। সেখানে জগমোহন হরিমোহন পুরন্দর ননীবালা এমনকি শচীশেরও একটা চরিত্ররেখা সংহত হতে পেরেছে - পারিপার্শ্বিক সমাজ প্রবুস্ক ঘটনাধারা ও তার বিভিন্ন ব্যক্তিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পারম্পর্যে।"[৭৬] এর পর থেকেই জীবনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উৎসারিত হয়েছে ব্যক্তির অন্তশ্চেতনা মন্থন করে। শচীশ এই জ্যাঠামশায়ের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে। শচীশের জীবনজিজ্ঞাসা উপন্যাসের মৌল আধেয় হওয়ায় তার উৎসভূমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। "জ্যাঠামশায় জগমোহন সামাজিক পরিসরের সূত্রধার, আবার সত্তার আমূল পুনর্নির্মাণের তিনিই উদ্‌গাতা। শচীশের আত্মসন্ধান উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে যত বিমূর্তায়িত হয়ে উঠুক না কেন, এর প্রাথমিক পাঠ জ্যাঠামশাই দিয়েছিলেন।"[৭৭]

জ্যাঠামশাই জগমোহনের জীবন ও চরিত্র যেমন শচীশের চরিত্রগঠনের মৌল ভিত্তি, তেমনি জ্যাঠামশায়ের শিক্ষার মধ্যেই শচীশের আত্মানুসন্ধানের আর্তি বীজাকারে নিহিত ছিল, জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুজনিত শূন্যতায় যা ক্রিয়াত্মক রূপ ধরেছে। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরও তাঁর অসাধারণ চরিত্রের দুর্লভ দীপ্তি শচীশের পরবর্তী জীবনের আলোকরেখা হয়ে থেকেছে। শচীশের নিজের কথাতেই এর স্বীকৃতি আছে। লীলানন্দ স্বামীর রসঘন পরিবেশে 'জন্মকাল হইতে মুক্তির মধ্যে মানুষ' শচীশকে জড়িয়ে পড়তে দেখে আশ্চর্য শ্রীবিলাসের প্রশ্নের উত্তরে শচীশ জানিয়েছে, "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিও।" (শচীশ - ৪)

আবার শ্রীবিলাসের জীবনেও জ্যাঠামশায়ের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থেকেছে। জ্যাঠামশায়ের চ্যালা নাস্তিক শ্রীবিলাস চৈত্র মাসে বিয়ে করেছে, জ্যাঠামশায়ের হিতবাদী কর্মধারা শ্রীবিলাসের মধ্যদিয়ে সচল থেকেছে। এমনকি জ্যাঠামশায়ের কলিকাতার বাসায় আশ্রয় নেবার পর 'দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল।' (শ্রীবিলাস - ৫) মৃত্যুতেই যে জ্যাঠামশায়ের মতো অসামান্য জীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে না, শচীশ শ্রীবিলাসের পরবর্তী জীবন তার প্রমাণ। বলাকার *ছবি* কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন,

"তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।"[৭৮] -জ্যাঠামশায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জ্যাঠামশায়ের এহেন গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ জ্যাঠামশায় অংশটিকে সযত্নে সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'দামিনীর ভাবপরিবর্তনই গ্রন্থ মধ্যে প্রধান সমস্যা' বলে মনে করায় জ্যাঠামশায় অংশের বিস্তারিত বিবরণ উপন্যাসের গঠনশৈথিল্যের প্রমাণ বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে।[৭৯] অপরদিকে আমাদের পাঠে শচীশের আত্মানুসন্ধান উপন্যাসের মৌল আধেয় হওয়ায় এবং শচীশকে উপলক্ষ করেই কাহিনীতে দামিনীর স্থান ঘটায় জ্যাঠামশায় অংশের বিস্তৃত উপস্থাপন রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শিল্পসচেতনতারই পরিচায়ক। উপরন্তু দামিনীর জীবনসংরাগ প্রকট হয়ে উঠেছে ননীবালার বিপ্রতীপে, যা বিবৃত হয়েছে জ্যাঠামশায় অংশে।

জ্যাঠামশায় অংশে সামাজিক অচলায়তনের যে রূপ ফুটে উঠেছে, দামিনীর বঞ্চিত ভাগ্যের পটভূমি তার মধ্যে দুর্লক্ষ্য থাকে না।

রবীন্দ্র সাহিত্যে চতুরঙ্গের জ্যাঠামশাই এবং *রবিবার*এর অভীক এই দুটি নাস্তিক চরিত্র তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তায় উজ্জ্বল। এই দুটি চরিত্র সৃজনের পেছনে রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা যে ক্রিয়াশীল ছিল, তা সচেতন পাঠকের আগোচর থাকে না। বিশেষত আচলায়তনের সমর্থক হরিমোহন-পুরন্দরের অমানবিকতার বিপরীতে শুদ্ধ মানবপ্রেমী জগমোহনের নাস্তিক্যধর্ম যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তাতে জগমোহনের নাস্তিক্যধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং হরিমোহন-পুরন্দরের জগতের প্রতি তীব্র ঘৃণা অপরিজ্ঞাত থাকে না। সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত *বিবেচনা ও অবিবেচনা* প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে গতির কথা বলেছেন, জগমোহন যেন সেই গতিরই মূর্ত প্রতীক।

> "এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত একথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া পুরাতন বেড়া সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, তাহাদের সাহসের অন্ত নাই বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিস্কৃত হইয়া পড়ে যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।"[৮০]

একই সময়-পরিসরে জগমোহন ও হরিমোহনের সহাবস্থান এই গতি-স্থিতির টানাপোড়েনের শিল্পিত রূপ।

বস্তুতঃ জ্যাঠামশায় অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করে শচীশ অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে জগমোহনের মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত প্রতিটি পরিচ্ছেদেই ঔপন্যাসিক নিপুণ কৌশলে জগমোহনের বিপ্রতীপে হরিমোহন-পুরন্দরের বিপরীত আচরণের প্রসঙ্গ এনেছেন, যার ফলে জগমোহন মহানুভবতায় উজ্জ্বল হয়েছে আরও। 'সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারের বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই তেমনী বিপরীত।' জগমোহনের পরিচয় শুরু হয়েছে তাঁর নাস্তিকতার সংবাদ দিয়ে "তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। ... যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল।" (জ্যাঠামশায় - ২) এবং 'লৌকিক বা আলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ' ছিলেন। অপরদিকে 'তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃতে' গড়বন্দী হরিমোহন ঐহিক ও পারত্রিক সকল স্তরেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থেকেছেন।

এই একই বৈপরীত্য দেখা যায় দুজনের স্নেহে প্রতিপালিত পুরন্দর ও শচীশের মধ্যেও। হরিমোহনের স্নেহের রসে পুরন্দর প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিল। "পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।" অপরদিকে জ্যাঠামশায়ের অভিভাবকত্বে "শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজী লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। ... তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।" পুরন্দরের বহুগামিতায় হরিমোহনের সস্নেহ প্রশ্রয় থাকলেও জগমোহন ও শচীশের মুক্ত চিন্তার আলাপচারিতায় তার আপত্তি ছিল। ননিবালাকে ভোগ করে ত্যাগ করার ক্ষেত্রে হরিমোহনের সমর্থন থাকলেও, তাকে মানুষের মর্যাদা দেওয়াটা 'অশাস্ত্রীয় অন্যায়' বলেই মনে হয়েছে। ননিবালার প্রশ্নে "জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি, একী কাণ্ড জগাই। পাপ বিদায় করিয়া দে। জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি

বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?" (জ্যাঠামশায় - ৫) শহরে প্লেগ দেখা দিলে ধার্মিক হরিমোহন 'খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া' পালিয়ে গেলেও নাস্তিক জগমোহন প্লেগাক্রান্তদের সেবায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রয়ে গেলেন। জগমোহন তাঁর নবীন বিশ্ববীক্ষার ক্রিয়াত্মক রূপ দিয়েছেন, বুদ্ধিজীবীসুলভ গণবিচ্ছিন্নতা তাঁর ছিল না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রচলিত অর্থে নাস্তিক জগমোহন তাঁর মহানুভবতায় ধার্মিক হরিমোহনের ভূবন থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত। মানবপ্রেমী জগমোহনের নাস্তিক্যবাদ আসলে মানববিশ্বের প্রতি গভীর অস্তিবাদী প্রত্যয়। জগমোহন সম্পর্কে যথার্থই বলা চলে "জ্যাঠামশায় বাঙালি সমাজের এক ক্রান্তিকালের বার্তা নিয়ে আখ্যানে উপস্থিত হয়েছেন। একদিকে রেনেসাঁসের জীবনচেতনা যুক্তিবাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা তৈরি করতে চাইছে, অন্যদিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের চোরাচালিতে তলিয়ে যাচ্ছে সমস্ত শুভবুদ্ধি। এই দুইয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজে তখন বিচিত্র-জটিল কৌণিকতা তৈরি হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক রাত্রির ঘন অন্ধকার দূর করার জন্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ শুধু মশাল তুলে নিচ্ছিলেন হাতে। জগমোহনও এই সময়ের যাবতীয় কূটাভাস মন্থন করে সব হলাহল নিজে পান করতে চাইছিলেন যাতে তাঁর স্নেহাস্পদ ভ্রাতুস্পুত্র শচীশ পথ চলার শক্তি ও শৌর্য অর্জন করতে-করতে অমৃত গ্রহণ করতে পারে।"[৮১]

প্রত্যক্ষ মানুষই ছিল জগমোহনের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে, মানুষই ছিল তাঁর ভগবান। তাঁর যুক্তি ছিল "ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।" (জ্যাঠামশায় - ৩) 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' গরজে জগমোহন মানবসেবায় ব্রতী হয়েছেন, যার পেছনে ছিল বেন্থামের (Bentham) উপযোগবাদ (Utilitarianism)। বেন্থামের উপযোগবাদের মানবিক আবেদন অন্যান্য চিন্তাপ্রস্থানেও প্রভাব ফেলেছিল -

"The Social Philosophy of the Philosophical Radicals was in essence a program at legal, economic and political reform connected as they supposed by the fact that they are all derivative from the principle of the greatest happiness of the greatest numbers."[৮২]

এমনকি বেন্থামের তত্ত্ব অনুযায়ী সুখ বৈজ্ঞানিক ভাবে পরিমাপযোগ্য হয়ে উঠেছিল -

"He (Bentham) assumed, as had commonly been done by the hedonest moralists, that pleasure and pain are commensurable, a given amount of the other ; and also that they can be added, so that a sum of pleasures may be calculated which will define the greatest happiness both of an individual and a group of individuals. In this calculation four dimensions 'or phase', of a pleasure or pain must be considered ; its intensity, its duration, the certainty with which it will follow a given kind of action, and the remoteness of the time at which it will occur."[৮৩]

কিন্তু 'মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত' এবং যা চোখে দেখা যায় ও কানে শোনা যায়, তার বাইরেও যে কিছু আছে তা অচিরেই জগমোহনের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, শচীশকে বিদায় জানাতে গিয়ে এবং ননিবালার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। লোকনিন্দার চাপে শচীশকে 'গুডবাই' বললেও এক অনির্দেশ্য তীব্র বেদনায় যুক্তিবাদী জ্যাঠামশায় 'দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল - তিনি সাড়া দিলেন না।' (জ্যাঠামশায় - ৪) শচীশকে যে এক দুই তিনের কোঠায় ফেলা যায়

না, তা জগমোহন উপলব্ধি করেছে বলেই শচীশের বিদায় 'জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।' (জ্যাঠামশায় - ৪) জগমোহনের যুক্তিবাদী জীবনের ওপর দ্বিতীয় ধাক্কা এলো আরও প্রবল রূপে। যৌবনে বিপত্নীক জগমোহন ম্যালথসের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ না করলেও ননিবালাকে দেখে তাঁর 'চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।' জগমোহন পরম স্নেহে স্বীকার করেছে "মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।" (জ্যাঠামশায় - ৬) জগমোহনের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদের ভিত যে ক্রমশ টলে উঠছিল, এই মনোভাব তার প্রমাণ। অবশেষে তার বুদ্ধিবাদী জীবনের ওপর চরম আঘাত হানে ননিবালার আত্মহত্যা। ননিবালা জীবন দিয়ে জ্যাঠামশাই এবং শচীশকে এটাই বুঝিয়ে গেল যে, মানুষের উপকার করতে চাইলেই উপকার করা যায় না, যুক্তির পরম্পরায় ধরতে চাইলেও মানুষের ক্ষেত্রে এই যুক্তিক্রম খাটে না।

৫.৪.১. এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিভে যাওয়ার পর -

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর এই প্রশ্নই শচীশকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে। প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের গরজে অসহায়া ননিবালাকে বিবাহ করতে চাইলেও যে বিবাহ করা যায় না, তা শচীশ উপলব্ধি করে। জ্ঞান আর কর্মের বাইরেও যে কিছুর উপস্থিতি অনিবার্য, তা ক্রমশঃ শচীশকে সংশয়ী করে তোলে। অথচ যে 'জ্যাঠামশাইয়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে', সেই জ্যাঠামশাইও আজ মৃত। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুজনিত বিপুল শূন্যতা যখন তাকে গ্রাস করতে উদ্যত, এই শূন্যতা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে শচীশকে যেতে হল বিপরীত দিক থেকে সত্যের সন্ধানে। জ্যাঠামশায় 'না ঈশ্বরে' বিশ্বাস করতেন। যাকে কানে শোনা যায় না ও চোখে দেখা যায় না, তা সবই ছিল বুদ্ধিবাদী জ্যাঠামশায়ের কাছে পরিত্যাজ্য, অপরদিকে শচীশ এ সময় উপলব্ধি করেছে 'এক ভাবে যাহা না, আর এক ভাবে তাহা যদি হাঁ না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।'

(শচীশ - ২) কেননা, 'শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই'।

এই বোধে পীড়িত হয়ে, সেই হাঁ, সেই সদর্থকের সন্ধানে, জ্যাঠামশায়ের অস্বীকৃত জগৎকে জানার আগ্রহে শচীশ আশ্রয় নিয়েছে লীলানন্দ স্বামীর। জ্যাঠামশায়ের জ্ঞানের একমাত্রিক পথ ছেড়ে তাকে ধরতে হয়েছে ভক্তির একমাত্রিক পথ। বস্তুতঃ শচীশের নিরীশ্বর বুদ্ধিচর্চার কঠিন ভিতটিকে দুর্বল হতে দেখা যায় মৃত জ্যাঠামশায়কে শচীশের প্রণাম করবার মধ্যদিয়ে। এদের মধ্যে প্রণাম করবার রীতি না থাকলেও এবং 'শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশাইকে প্রণাম' না করলেও 'মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষ বারের মতো তাঁর পায়ের ধুলা লইল।' সত্যান্বেষণের যাত্রাপথে লীলানন্দ স্বামী একটি মাধ্যম হলেও, এই রসের পথও শচীশের কাছে পরিত্যাজ্য হয়েছে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে, জ্যাঠামশায় অংশে যেমন ছিল ননিবালার আত্মহত্যা।

শচীশের সত্যান্বেষণের পথে এই রসের পর্যায়ে দামিনীর প্রবেশ ঘটে। যে 'জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে যে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে '। জীবনবঞ্চিত দামিনী নানা ভাবে আকর্ষণ করতে থাকে শচীশকে, যার চরম ও করুণ পরিণতি গুহার অন্ধকারে নিজেকে শচীশের কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণের মধ্যে।

> "এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিঃশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!
>
> তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে - এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ডু, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই - তার গ্রাস

করিবার প্রণালীটা কি ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে - ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে - সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম। ... হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ... অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?" (শচীশ - ১০)

লীলানন্দের রসের সাগরে নিমজ্জিত শচীশের কাছে এই সময় আর সবই তুচ্ছ মনে হয়েছে। গুহা থেকে ফেরার পর দামিনীর বিদ্রোহকে একারণেই তার অবাধ্যতা বলে মনে হয়েছে 'কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে, আর ঐ একটুখানি মেয়ে ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ!' (দামিনী - ১)

শচীশ নিছক তত্ত্বের প্রতীক মাত্র নয়, বরং পুরোপুরি রক্ত মাংসের মানুষ বলেই এই সময়ে তার "মনে হইল, সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনোদিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।" শচীশের মধ্যে যৌনবোধ থাকার জন্যই এই বোধ তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে তার মধ্যে নীরবে চলতে থাকা 'আত্মিক সংগ্রামের দুরন্ত বিক্ষোভ'।

"তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি।
ঘুরি যে সময় নেই -"[৮৪]

যেন শচীশেরও উচ্চারণ হতে পারত।

কিন্তু কিছুতেই শচীশ রোধ করতে পারে না 'মনের মাটিতে দামিনীর গোপন পদপাত'। প্রকৃতির ডাকে ভেতরে ভেতরে তার মন বিচলিত হয়ে ওঠে জন্যই 'কিছুদিন শচীশ পূর্বের চেয়ে আরো অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল।' (দামিনী - ৩) কিন্তু প্রকৃতির সংসর্গ এড়াতে চাইলেই যে প্রকৃতি তাতে সম্মত হবে, এমন কোনো কথা যেহেতু নেই, তাই 'শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা টিপিয়া, তামাক সাজিয়া, কিছুতেই এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।' (দামিনী - ৩) কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনার এত সব আয়োজনের পরও শচীশ দামিনীর গভীর আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে নি বলেই "শচীশ আজকাল কেমন একরকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।" (দামিনী - ৪)

এমতাবস্থায় দামিনীর আকর্ষণ শচীশের কাছে দুর্মোচ্য হয়ে ওঠায়, শচীশকেই দামিনীর কাছ থেকে সরে যেতে হল। সমুদ্রের ধারে। নির্জনে সাত দিন ধরে চলল নিজের সাথে বোঝাপড়া। কিছুদিন পর ফিরে এসে দামিনীর সঙ্গ স্বীকার করে নিলেও শচীশ যে রসের সাধনায় তন্ময় হয়ে চিত্তের স্থৈর্য ফিরে পায় নি, তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে শচীশের অবয়বগত বর্ণনায়, এবং অনুভব করি শচীশের প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব, "শচীশের এ কী চেহারা! প্রচণ্ড-ঝড়ের-ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা; চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।" (দামিনী - ৪)- এখানে 'প্রচণ্ড-ঝড়ের-ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল' জাহাজের চিত্রকল্প যেন ভেতরে ভেতরে লীলানন্দ স্বামীর রসবাদী পথের অসারতা অনুভব করতে পারা শচীশের পথভ্রষ্টতাকেই প্রতীকায়িত করেছে। যার চরম পরিণতি ঘটেছে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যাকে উপলক্ষ করে।

জীবনরসের রসিক দামিনীর প্রবল প্রবর্তনায় এভাবেই ভাবরসে নিমজ্জমান শচীশের ভাবের ঘোর কাটে। 'দেউল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, শচীশের ওপর দামিনীর এহেন অভিঘাতে যেন তারই ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

"রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি।
রাখি নি তার জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার, ...

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পসম
কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।"[৮৫]

বহির্জগৎ বিচ্ছিন্ন পাষাণ দেউল যেমন বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হয়েছিল, প্রকৃতিবিবর্জিত শচীশের ভাবরাজ্যের দেউলও দামিনীর অভিঘাতে সংকটাপন্ন হয়েছিল। দামিনীর মধ্যেই বজ্রের সম্ভাবনা থাকা এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

ননিবালার মৃত্যু প্রমাণ করেছে হৃদয়াবেগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে মানুষকে যুক্তির পরম্পরায় ধরতে গেলে তার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে। অপরদিকে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র হৃদয়াবেগকে সর্বস্ব করে তুললে তার পরিণাম কতটা মর্মান্তিক হতে পারে। এক্ষেত্রে শচীশই যে কেবল দামিনীর মোহের ঘোর কাটিয়ে দিয়েছে, এমন নয়, বরং দামিনীও শচীশের রসের ঘোর কাটাতে সাহায্য করেছে। জ্যাঠামশায়ের শিক্ষালস্ক যে 'না' - এর স্বরূপ আবিষ্কারের লক্ষ্যে এবং 'একভাবে যাহা না, আর একভাবে' তার ইতিবাচকতার সন্ধানকল্পে শচীশের লীলানন্দ অবলম্বন, তার কাছে ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে দামিনীর উচ্চারণে

> "তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছে, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ? ... তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই।" (দামিনী - ৬)

শচীশের আত্মস্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্রে লীলানন্দ স্বামী আর 'হাঁ'- এর প্রতিনিধি রইলেন না, হয়ে উঠলেন পুঞ্জীভূত মিথ্যা অর্থাৎ 'না' এর প্রতিভূ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এর পর থেকে শচীশের জীবনের মতই পাঠকৃতি থেকেও লীলানন্দের নির্বাসন ঘটেছে।

অর্থাৎ সত্যান্বেষণের পথে লীলানন্দ স্বামী উপলক্ষ মাত্র, 'শচীশ তাকে আত্মোপলব্ধির সোপান হিসেবে গ্রহণ করেছে মাত্র'। আত্মবোধ যার অন্বিষ্ট অনিবার্যভাবেই তাকে এর পর যেতে হয়েছে একক সাধনার পথে। তাই যে শচীশ গুরুবাদী সমাজের মুখপাত্রস্বরূপ একদিন বলেছিল "তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও? শেষকালে মরিবে।" (দামিনী - ৩) সেই শচীশই পরবর্তীতে উপলব্ধি

করেছে "আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন - গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাইবার পথ।" (শ্রীবিলাস - ২) শচীশ অনুভব করেছে গুরুবাদ যে সত্যের দিকে সহজে নিয়ে যায়, তা ফাঁকি, সত্য নয়। এই পর্যায়ে 'উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে' শচীশের লড়াই কতটা প্রবল ছিল, তা বোঝা যায় শ্রীবিলাসের দেখায় -

> "আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে - স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।" (শ্রীবিলাস - ২)

আত্মোপলব্ধির যন্ত্রণাময় এই অধ্যায়ে শচীশ উপলব্ধি করে "আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন।" (শ্রীবিলাস - ২) অর্থাৎ কোনো বারোয়ারী ধর্ম নয়, শচীশ চেয়েছে তার নিজস্ব ধর্ম - যে ধর্ম হয়ে উঠবে তার যথার্থ আশ্রয়। শচীশের এই উপলব্ধিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের কথায়,

> "বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর-কাহারো কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি।"[৮৬]

'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার', বলতে বলতে শচীশের আত্মোপলব্ধির সাধনা যতই বিমূর্ত হয়ে উঠুক না কেন শেষ পর্যন্ত শচীশ যে বাস্তবের মাটিতে স্থিত হয়েছে, তার সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। শচীশের মতো উপন্যাসও পেয়েছে তার বস্তুধর্ম।

সত্যপলব্ধির পথে যে প্রধান চারটি অন্তরায়ের কথা ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) তাঁর *নিউ মেথডলজি* (New Methodology - 1620) গ্রন্থে বলেছেন, শচীশকে সেগুলি অতিক্রম করতে দেখা যায়।

ক ঃ- Idols of the Tribe ঃ মানবজাতির কতকগুলি সাধারণ সংস্কার, তার মধ্যে প্রধান হল, 'যা ভালো লাগে তাই সত্য বলে বিশ্বাস করার প্রবৃত্তি'।

খ ঃ- Idols of the Cave ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তির কতকগুলি নিজস্ব সংস্কার আছে, যা সে ছাড়তে চায় না'।

গ ঃ- Idols of the Marketplace ঃ মানুষের মনের ভাষাগত সংস্কার, যে শব্দগুলি প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলে মানুষের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাসে প্রোথিত হয়ে যায়। যেমন, ধর্ম, দৈব, অদৃষ্ট, ভাগ্য, ভূত ইত্যাদি।

ঘ ঃ- Idols of the Theatre ঃ 'এগুলি হল বিশেষ চিন্তাধারার সংস্কার', কিছু দার্শনিক চিন্তা যা মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়।[৮৭]

ভারতীয় চিন্তনে সত্যান্বেষণের ক্ষেত্রে যে পাঁচটি অন্তরায় আছে, শচীশ সেগুলোকেও অতিক্রম করেছে। ক) পারিবারিক বন্ধন, খ) সমাজবন্ধন, গ) শাস্ত্রবন্ধন, ঘ) গুরুবন্ধন এবং ঙ) মন্ত্র বন্ধন। [৮৯] আজকের এই একবিংশ শতকেও যখন আমরা বেকন কথিত চতুর্বিধ Idols বা 'ভূতের' কাছে এবং ভারতীয় চিন্তন নির্দেশিত পঞ্চবিধ প্রকরণে নিজেদের বিচারহীন ভাবে সঁপে দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও দল-উপদলের গহ্বরে নিশ্চন্ত আশ্রয় খুঁজছি, তখন আত্মদীপ হয়েওঠার লক্ষ্যে শচীশের সংগ্রাম যেন আমাদের নতুন করে বাঁচার পথ দেখায়। আজকের এই বিপন্ন সময়ে যখন দৃশ্য-অদৃশ্য বিভিন্ন শক্তি অনবরত চোখ রাঙিয়ে আমাদের উস্কেশ্যে বলতে থাকে -

'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই ...
সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান -"

এবং সরু ও ছোটো হয়ে যাওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্ত অসাড় চেতনায় যখন এই প্রশ্নও আর জাগে না,

"আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে!
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?"[৮৯]

- তখন শচীশ আমাদের প্রেরণার আকর হয়ে ওঠে। শচীশের আত্মোপলব্ধির প্রেরণাধারায় স্নাত হয়ে শচীশের উদ্দেশ্যে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে -

"সকলেই আছে বুকজলে
কেউ জানে কেউ বা জানে না
আমাকে যে সহজে বোঝালে
প্রণাম তোমাকে বৃষ্টিধারা।"[৯০]

- ৫ -

৫.৫. দামিনী ঃ 'প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ' -

দামিনী চরিত্র পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ সময়ের থেকে অগ্রবর্তী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। স্বামী শিবতোষ দামিনীর ভক্তিহীনতার দণ্ডস্বরূপ সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সমেত গুরু লীলানন্দ স্বামীর হাতে তাকে সমর্পণ করে যান। 'শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না'। 'জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায়' শিবতোষ যখন 'কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ' করে, প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই দামিনীর উপর 'ভক্তির দস্যুবৃত্তি' শুরু হয় এবং তখনথেকেই দামিনী প্রতিবাদী। এরপর শিবতোষ লীলানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে আসার পর থেকে 'জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য' ভক্তির দস্যুবৃত্তি যত বৃদ্ধি পেয়েছে, দামিনীর বিদ্রোহাগ্নিও ততই প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে : 'ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয়

নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে'। অবশেষে শিবতোষ 'মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল'। অর্থাৎ জীবনপিপাসু দামিনী প্রথম থেকেই জীবন বঞ্চিত, অথচ এই বঞ্চনাকে সে যথাপ্রাপ্ত হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। এই মেনে না নিতে পারা তাকে ঠেলে দিয়েছে বিদ্রোহের পথে। দামিনী প্রথমাবধিই বিদ্রোহী, যখন থেকে সে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। *হৈমন্তী, বোষ্টমী* ও *স্ত্রীর পত্র*র মৃণাল যেভাবে বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে বলতে চেয়েছে সকল প্রকার অন্যায়কে মেনে নিয়ে পুরুষতন্ত্রের সাথে আপোষ রক্ষা করে চলা নারীজীবনের আদর্শ নয়, দামিনী আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে তার জীবনে যথাপ্রাপ্ত যা কিছু, যা তার জীবনপিপাসার অন্তরায় হয়েছে, সব কিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী যেমন হয়েছে, তেমনি নিবৃত্তির মধ্যদিয়ে সে তার জীবনপিপাসাকে দমন করা দূরের কথা বরং শচীশের মধ্যদিয়ে তাকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত সার্থক এবং বাস্তব রূপ পেয়েছে শ্রীবিলাসের সাথে বিবাহের মধ্যদিয়ে।

শচীশ দামিনীকে দেখেছে ননিবালার বিপ্রতীপে। সে তার ডায়ারিতে লিখেছে -

> "ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি - অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।" (শচীশ - ৬)

রসের সাগরে নিমজ্জিত এই পর্যায়ে শচীশ স্বাভাবিক ভাবেই দামিনীর শোভা দেখেছে, দামিনীকে নয়। অপরদিকে দামিনী চেয়েছে শচীশকে অবলম্বন করে তার জীবনপিপাসা চরিতার্থ করতে। শ্রীবিলাসই দামিনীকে যথার্থভাবে দেখেছে -

"দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্ মিক্ করিয়া উঠিতেছে।" (শচীশ - ৬)

উপন্যাসে ননিবালা সামান্য অংশ জুড়ে থাকলেও, তার মধ্যদিয়েই সে সামাজিক অন্ধকারটিকে চিনিয়ে দিয়েছে। জগমোহন যথার্থই উপলব্ধি করেছেন "এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা।" (জ্যাঠামশায় - ৫) 'তাকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই' এই বেদনা বুকে নিয়ে ননিবালার আত্মহনন পুরুষতন্ত্র দ্বারা অধিকৃত নারীমনের করুণ পরিণতি দেখিয়ে দেয়। এই নারী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে না। ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও পুরুষতন্ত্র একই আধিপত্যবাদের দুটি ভিন্ন অভিব্যক্তি হওয়ায় ঔপনিবেশিকৃত নারীমন নিয়ে ননিবালারা শুধু নিজেদের নিঃশেষ করে দিতেই জানে। অপরদিকে দামিনী আধিপত্যবাদের মূল ধরেই নাড়া দিয়েছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য,

> "উপন্যাসের মূল ঘটনায় দামিনীর বিদ্রোহ আসল কথা। দামিনীই প্রমাণ করল যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সামাজিক ও পারিবারিক অর্থনৈতিক কাঠামো-ই শুধু পুরুষপ্রাধান্যসূচক, বা পুরুষাধিপত্যে চালিত নয়, আধ্যাত্মিক মুমুক্ষাও সেখানে পুরুষাধিপত্যের বশম্বদ। ননিবালার ও নবীনের স্ত্রীর ভিন্নার্থক আত্মহত্যা থেকে মনে হয় লেখক এ সময়ে নারীর ব্যক্তিমর্যাদার অবদমন বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন দামিনীকল্পনা তারই ফল।"[৯১]

নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল বলেই দামিনী লীলানন্দের আশ্রয়ে থেকেও আশ্রিতার মতো বশম্বদ ছিল না। এই অধিকার সচেতনতা থেকেই দামিনী লীলানন্দের প্রস্তাব মতো তার মাসির বাড়িতে থাকতে রাজি হয় নি, বরং লীলানন্দ যে তার দায়িত্ব নিতে বাধ্য সে কথা জোড়ের সাথেই জানিয়েছে, 'সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।' এ-সময় দামিনীর উচ্চারণে যে নেতিবাচক শব্দ পুনরাবৃত্ত হয়ছে, তা

দামিনীকে ঘিরে থাকা সর্বগ্রাসী শূন্যতার দিকেই ইঙ্গিত করে - "আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই; আমার বাড়ি নাই, কড়ি নাই, কিছুই নাই।" (দামিনী - ৪) সমালোচকের ভাষায় "নিরাশ্রয় অন্তেবাসী নারীর এই তীব্র নেতিবোধ তো জীবনতত্ত্বের অনুষঙ্গ নয় কেবল, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দহনে ছাই হয়ে যাওয়া নারী সত্তার ঔপন্যাসিক প্রকাশও বটে।"[৯২] শচীশ দামিনীকে চ'লে যেতে বললে, তার উত্তরে দামিনী যা বলেছে, তাতেও তার এই অধিকারবোধ ক্রিয়াশীল থেকেছে -

> "আমি কি সাধ করিয়া আছি! তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর কোনো রাস্তা রাখিয়াছ? ... আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।" (দামিনী - ৩)

এসময় দামিনী যেন হয়ে ওঠে পুরুষতন্ত্রের নিপীড়নে রুদ্ধকণ্ঠ নারীসমাজের প্রতিনিধি।

শিবতোষ কর্তৃক লীলানন্দের কাছে নিজের সমর্পণকে নিজের দুর্ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়নি বলেই লীলানন্দের আশ্রমে থেকে আনুগত্য-ভক্তি ও সেবার জগতে দামিনী মূর্তীমতী স্পর্ধা হয়ে উঠেছিল। একারণেই 'দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর' ভুগলেও এবং 'এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি' করলেও দামিনীকে শাসন করা তো দূরের কথা বরং অদৃষ্টবাদের প্রবক্তা লীলানন্দ অদৃষ্টকে চ্যালেঞ্জ করা দামিনীকে ভয় করে চলেছেন।

এহেন দামিনী স্থির হয়েছে শচীশকে দেখে এবং ভালোবেসে। জীবনে যে ভালোবাসা সে পায়নি, তা পেতে চেয়েছে শচীশের থেকে। কিন্তু সত্যান্বেষণের যাত্রার যাত্রী শচীশ এই পর্যায়ে ভাবসমুদ্রে নিমজ্জমান থাকায়, গুহার অন্ধকারে নিজেকে সমর্পণ করেও পরিণামে জুটল শচীশের পদাঘাত। যা তার মৃত্যুরও কারণ হয়ে রইল। এই নির্মম প্রত্যাখ্যানের পরও জীবনরসিক দামিনী শচীশের আশা ছাড়ে নি। চলল শচীশের প্রতি এক ধরনের ছদ্ম উপেক্ষা। এক্ষেত্রে তার অবলম্বন হয়ে উঠল শ্রীবিলাস।

বুদ্ধিমান শ্রীবিলাসের বুঝতে বাকি থাকে নি যে, সে উপলক্ষ্য মাত্র, দামিনীর লক্ষ্য আসলে শচীশ। এ সময় আহত চিলের পরিচর্যা এবং 'ভাঙা হাঁড়িতে ফুলগাছের চর্চা' তাৎপর্যপূর্ণ। টেলিগ্রাফের তারে ঘা খেয়ে আহত চিল যেন শিবতোষ কর্তৃক প্রদত্ত দামিনী এবং কাকের দল যেন লীলানন্দ ও তার সম্প্রদায়। আহত চিলের পরিচর্যায় দামিনীর জীবনাকাঙ্খাই যেন প্রতীকায়িত হয়েছে। ফুলগাছের চর্চার জন্য ভাঙা হাঁড়ির ব্যবহার জীবনবঞ্চিত শচীশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দামিনীর ভগ্ন জীবনের প্রতিই ইঙ্গিত করে। এরপর শচীশ দামিনীকে অন্যত্র সরে যাবার প্রস্তাব দিলে রুখে দাঁড়ায় দামিনী, প্রতিবাদে ঝলসে ওঠে সে, "তোমাদের কোনো ভক্ত-বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত-বা আর এক মতলবে আর এক বন্দোবস্ত করিবেন - মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ পঁচিশের ঘুঁটি?" কারও খেলার ঘুঁটি হতে চায় নি দামিনী। এ-যেন আজকের নারীচেতনাবাদের পূর্বগামী উচ্চারণ। মনে পড়ে শঙ্খ ঘোষের কবিতা

"তবু কি তোর ইচ্ছে করে আলগা খোলা শ্যামবাজারে
সবার হাতে ঘুরতে ঘুরতে বিন্দু বিন্দু জীবনযাপন?"[৯৩]

- এই 'বিন্দু বিন্দু জীবনযাপনের' বিরুদ্ধে দামিনীর প্রতিবাদ। সে চেয়েছে একটি পূর্ণ জীবনে স্থিত হতে। শচীশের মধ্যদিয়ে তা সম্ভব নয় জেনে শচীশকে সে গুরুর পদে বরণ করে নিয়েছে। শচীশের প্রতি তার অনুরাগ প্রেমে পরিণত হয়েছে, শ্রদ্ধা পরিণত হয়েছে ভক্তিতে। *নৈবেদ্যর* ৩০ সংখ্যক কবিতা যেন এসময় দামিনীর মানস পরিবর্তনের কাব্যরূপ-

"মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

এই প্রেম ও ভক্তি চরণে নিবেদন করা গেলেও, তা দিয়ে জীবনপিপাসা মেটানো যায় না, সংসার বাঁধা যায় না।

শচীশকে ত্যাগ করে দামিনী কলকাতায় চলে আসে শ্রীবিলাসের সাথে। কলকাতায় এসে দামিনীর আশ্রয়হীনতা যে সংকটের সৃষ্টি করে, শ্রীবিলাস তাকে সেই সংকট থেকে মুক্ত করে, তাকে

বিবাহ করে। কলকাতায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় দামিনীর তখন একমাত্র রাস্তা ছিল লীলানন্দের আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া, কিন্তু এ তো শুধু ফিরে যাওয়া নয়, বরং ফিরে গেলে এক মুহূর্তে ধ্বস্ত হত এতদিনের গড়ে তোলা দামিনীর বিদ্রোহীসত্তা। এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হলেও শ্রীবিলাস ও দামিনীর 'কোর্টসিপ' খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে 'সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়,'[৯৪] সেখানে কথা নয় বরং দুজনের নীরবতাই যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে।

> "দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান?
>
> আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।
>
> এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল, যে সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।" (শ্রীবিলাস - ৫)

এক বছরের দাম্পত্য জীবন যে দামিনী-শ্রীবিলাসের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভাবে সার্থক হয়েছিল, দামিনী পেয়েছিল তার বহুকাঙ্খিত জীবন, তা তাদের দুজনের স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট। "দামিনী বলিল আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই তুমি আর এই তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।" এবং শ্রীবিলাসের স্বীকারোক্তি ঃ "বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ... কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।" (শ্রীবিলাস - ৫)

মৃত্যুর পূর্বে দামিনী যেতে চেয়েছে সেই সমুদ্রের ধারে, যেখানে তার মৃত্যুর বীজই কেবল রোপিত হয়নি, রোপিত হয়েছে তার মোহমুক্তি, তার জন্মান্তরের বীজও। 'যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল', সেদিন

দামিনী শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলা নিয়ে তার শেষ ইচ্ছা জানিয়েছে, "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।" এখানে লক্ষণীয় দামিনী জন্মান্তরে শচীশকে চায় নি, চেয়েছে শ্রীবিলাসকে, যার মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হতে পারে জীবন পিপাসা, কেননা দামিনী 'সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ', সে যে 'জীবনরসের রসিক'। বৈধব্যের সংস্কার নয়, নয় অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সমর্পণ, দামিনী একান্তভাবেই জীবনরস পিপাসু, এই লক্ষ্যেই তার যত বিদ্রোহ, যত আয়োজন। এই দামিনী তাই স্বাভাবিক ভাবেই পরবর্তীতে কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে -

"সেদিন সমুদ্র ফুলে' ফুলে' হল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়
সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল: মিটিল না সাধ।
পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে। ...

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে।"[৯৫]

নির্দেশিকা ঃ-

১. দাশ, অমরেশ ঃ *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ নবমূল্যায়ন*, কলকাতা ঃ ২০০২, পৃঃ ৩৮ - ৩৯

২. ঘোষ, তপোব্রত ঃ *শ্রীবিলাসের ডায়ারি*, ভারবি, কলকাতা ঃ ২০০২, পৃঃ ২৯

৩. সরকার, সুশোভন ঃ *বাংলার রেনেসাঁস*, কলকাতা ঃ ১৪০৮, পৃঃ ৭৩

৪. গ্রন্থপরিচয় অংশ, *ছিন্নপত্র*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ঃ ১৩৮২, পৃঃ ২৯৩

৫. পত্র সংখ্যা - ১৫০, ঐ, পৃঃ ২৮২

৬. *মানুষের ধর্ম*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৩৭৭

৭. ১৭ সংখ্যক কবিতা, *উৎসর্গ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৩৩

৮. "রূপ ও অরূপ"। *সঞ্চয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৩৩৬

৯. "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত"। *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৪৩৭

১০. রায়, রথীন্দ্রনাথ ঃ *রবীন্দ্র-মনন*, কলকাতা ঃ ১৯৮৭, পৃঃ ৯৫

১১. *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৩৫২

১২. সেন, অজয় ঃ "স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙালি সমাজ"। *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*। সম্পাঃ হর্ষ দত্ত ও স্বপন বসু, কলকাতা ঃ ২০১০, পৃঃ ৪৫

১৩. তদেব, পৃঃ ৪৬

১৪. চৌধুরী, ভূদেব ঃ *রবীন্দ্র-উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে*, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, পৃঃ ৭৫

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা ঃ ২০০০, পৃঃ ১৬২

১৬. চৌধুরী, ভূদেব ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭ - ৬৯

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫

১৮. চৌধুরী, ভূদেব ঃ *বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্প ও গল্পকার*, কলকাতা ঃ ১৯৮৯, পৃঃ ৩০২

১৯. হোসেন, সৈয়দ আকরম ঃ *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, কলকাতা ঃ ২০১১, পৃঃ ১৯৮

২০. ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঃ *নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ২০০৮, পৃঃ ১৮

২১. Woolf, Virginia. "Mr. Bennett and Mrs. Brown". *The Hogarth Essays*. Loenard and Virginia Woolf, London: 1924, P. 1

২২. Ibid, P. 2

২৩. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার ঃ *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, কলকাতা ঃ ২০০১, পৃঃ ১৩

২৪. ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঃ *পিতৃস্মৃতি*, পৃঃ ১৫১ - ৫২ (নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৯৯৫, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৩৮)

২৫. হোসেন, সৈয়দ আকরম ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯

২৬. "লণ্ডনে"। *পথের সঞ্চয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষড়বিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫১৪

২৭. "বন্ধু"। ঐ, পৃঃ ৫১৬

২৮. "ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজ"। ঐ, পৃঃ ৫৩৩

২৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমারঃ *রবীন্দ্রজীবনকথা*, কলকাতা ঃ ১৪০১, পৃঃ ৮৮

৩০. তদেব, পৃঃ ৮৯

৩১. তদেব, পৃঃ ৯০

৩২. তদেব, পৃঃ ৯২

৩৩. হোসেন, সৈয়দ আকরম ঃ প্রাগুক্ত, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ২০১

৩৪. "সর্বনেশে"। *বলাকা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৪, পৃঃ ৩

৩৫. "গ্রন্থপরিচয়"। *বলাকা*, ঐ, পৃঃ ৫৯৭

৩৬. "শঙ্খ"। *বলাকা*, ঐ, পৃঃ ৮

৩৭. "গ্রন্থপরিচয়"। *বলাকা*, ঐ, পৃঃ ৫৯৭

৩৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ *বাখতিন ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা ঃ ১৯৯৬, পৃঃ ১০১

৩৯. দ্রঃ মজুমদার, নেপাল ঃ *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৯৯৫, পৃঃ ৩৪৯

৪০. দাশ, অমরেশ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১

৪১. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ঃ *রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ১৩৫৯, পৃঃ ২৩১

৪২. বসু, বুদ্ধদেব ঃ *রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য*, কলকাতা ঃ ১৯৬২, পৃঃ ৪৫

৪৩. চৌধুরী, বিশ্বপতি ঃ *কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ১৩৭১, পৃঃ ৭০

৪৪. বিশী, প্রমথনাথ ঃ *রবীন্দ্র বিচিত্রা*, কলকাতা ঃ ১৩৮৬, পৃঃ ২৯

৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ঃ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, পৃঃ ১৬০

৪৬. রায়, রথীন্দ্রনাথ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭

৪৭. রায়, নীহাররঞ্জন ঃ *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, কলকাতা ঃ ১৩৬৯, পৃঃ ৪২৬

৪৮. তদেব, পৃঃ ৪২৭

৪৯. সাহিত্য, ১৯ঃ২, জৈষ্ঠ - ১৩১৫, পৃঃ ১১৬ - ১৭। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ঃ চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, কলকাতা ঃ ২০১১, গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩১৫

৫০. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণঃ *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ১৪১১, পৃঃ ১০০

৫১. Preistley, J.B. Literature and Western man, Mercury Books, London: 1962, P. 65

৫২. রায়, দেবেশঃ *উপন্যাস নিয়ে*, কলকাতা ঃ ১৯৯১, পৃঃ ১৫

৫৩. তদেব, পৃঃ ১৫-১৬ (এই গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায়ে এ-সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে)

৫৪. চৌধুরী, প্রমথঃ "বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি"। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, কলকাতা ঃ ১৯৮৩, পৃঃ ৩৮

৫৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০ - ০১

৫৬. Bantock, G.H. "The social and intellectul background". *The Pelican Guide to English Literature: The Modern Age*, Vol - 7, Ed. Boris Ford, Penguin Book, London: 1969, P.p. 33 - 48

৫৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১

৫৮. "লড়াইয়ের মূল"। *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ২৭১

৫৯. "আট বছর আগের একদিন"। মহাপৃথিবী, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, কলকাতাঃ ১৯৮৮, পৃঃ ৯৭

৬০. "বোধ"। ধূসর পাণ্ডুলিপি, ঐ, পৃঃ ১৯

৬১. বিশী, প্রমথনাথ ঃ *বাংলাসাহিত্যে নরনারী*, কলকাতা ঃ ১৯৬৬, পৃঃ ১১৩

৬২. ৩০ সংখ্যক কবিতা, *নৈবেদ্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৩৪

৬৩. দাশ, অমরেশ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬

৬৪. "বোধ"। ধূসর পাণ্ডুলিপি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২

৬৫. "আট বছর আগের একদিন"। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭

৬৬. "তিমির হননের গান"। সাতটি তারার তিমির, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ঐ, পৃঃ ১০৭

৬৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯

৬৮. চৌধুরী, ভূদেব ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮

৬৯. দ্রঃ গ্রন্থপরিচয়, *ঘরে-বাইরে*, কলকাতা ঃ ১৪০৪, পৃঃ ১২৯৬

৭০. সবুজপত্র পর্বের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও চতুরঙ্গ সাধুভাষায় রচিত হওয়ার ব্যাখ্যা গবেষক তপোব্রত ঘোষ দিয়েছেন, 'যে-ডায়ারি ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দর গোড়াতেই শেষ হয়ে গিয়েছে তার উপর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দর চলিতভাষা আন্দোলনের কোনো প্রভাব না পড়াই সম্ভব'। - শ্রীবিলাসের ডায়ারি, তপোব্রত ঘোষ, পৃঃ ৩০

৭১. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ঃ রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প, কলকাতা ঃ ১৯৮৪, পৃঃ ২২৩

৭২. Woolf, Virginia. Ibid, p. 5

৭৩. গঙ্গোপাধ্যায়, মানব ঃ *নির্মাণে বিনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা ঃ ২০১১, পৃঃ ৪২ - ৪৩

৭৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮

৭৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৩ - ০৪

৭৬. চৌধুরী, ভূদেব ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯

৭৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২

৭৮. "ছবি"। *বলাকা*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০ - ১১

৭৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪

৮০. "বিবেচনা ও অবিবেচনা"। *কালান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৮

৮১. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১ - ১২

৮২. Sabine, H. George and Thorson, L. Thomas. *A history of Political theory*, Oxford and IBH Publishing, New Delhi: 1973, P. 612

৮৩. Ibid. p. 615

৮৪. "উর্বশী"। উর্বশী ও আর্টেমিস, *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা ঃ ১৯৮১, পৃঃ ১৭

৮৫. "দেউল"। *সোনার তরী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা ঃ ১৩৯৯, পৃঃ ৯৩ - ৯৫

৮৬. "মহাপুরুষ"। *চারিত্রপূজা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা ঃ ১৩৯৩, পৃঃ ৫৩৬

৮৭. দ্রঃ ঘোষ, বিনয় ঃ *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা ঃ ১৯৯২, পৃঃ ১৩০ - ৩১

৮৮. দ্রঃ গঙ্গোপাধ্যায়, মানব ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০

৮৯. "ভিড়"। নিহিত পাতালছায়া, *শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা ঃ ১৯৯০, পৃঃ ৩৪

৯০. "বৃষ্টিধারা"। আদিম লতাগুল্মময়, ঐ, পৃঃ ৭৮

৯১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫

৯২. ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫

৯৩. "ফুলবাজার"। নিহিত পাতালছায়া, ঐ, পৃঃ ৩৬

৯৪. "সঙ্গিনী"। মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়, *শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা ঃ ১৯৯০, পৃঃ ১০০

৯৫. "দামিনী"। স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, *বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা*, কলকাতা ঃ ১৯৮১, পৃঃ ১৬৪